খনিজ তেল
বা
পেট্রোলিয়াম

খনিজ তেল

বা

পেট্রোলিয়াম

(ভারত সরকার কর্তৃক পুরস্কৃত)

সুবোধ দাশগুপ্ত

এন ভট্টাচার্য এণ্ড কোং
৫ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

This book in Bengali, "Khanija Tel ba Petroleum" (Mineral Oil or Petroleum) has obtained a prize in the 19th Manuscript Competition for Neo-literates held in 1976 under the Ministry of Education & Social Welfare (NFE), Govt. of India, New Delhi

Published by :

B. Bhattacharya
N. Bhattacharya & Co.
5, Shyama Charan De Street
Calcutta 700 012

Design & Block :

Process & Allied Guild
12 Pratap Chatterjee Lane,
Calcutta 700 012

Photographs of Oil fields
by Courtesy :
Assam Oil Company, Digboi,

Printed by :

Good Associates
16/3E Dixon Lane
Calcutta 700 014

Reprint—Nov. 1988

Price Rs. 10.00

ছুটি কথা

ডিগবয় থেকে আসাম অয়েল কোম্পানী কয়েকখানা মূল্যবান ফটোগ্রাফ পাঠিয়ে বিশেষ সাহায্য করেছেন। আর সাহায্য করেছেন শ্রীসন্বিত সাহা বইখানাকে সুসজ্জিত করবার ভার নিয়ে। দরবারী উদ্যোগের শ্রীবারীন মিত্র পাণ্ডুলিপি আগাগোড়া সংশোধন করে আমার পরিশ্রম অনেক লাঘব করে দিয়েছেন এবং শ্রীভুবণ ভট্টাচার্য প্রকাশনার দায়িত্ব নিয়ে আমাকে এক গুরু দায়িত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছেন।

এঁদের সকলের কাছেই আমি কৃতজ্ঞ।

পরিশেষে বলতে চাই যে বইখানা যাঁদের জন্য লেখা তাঁরা আনন্দ পেলে আমিও আনন্দ পাব।

সুবোধ দাশগুপ্ত

সূচীপত্র

মলাটের ছবি ঃ ডিগবয়ে শোধনাগারের দৃশ্য, আসাম অয়েল কোম্পানীর সৌজন্যে প্রাপ্ত ফটো থেকে।

গোড়ার কথা

কেরোসিন তেল আমরা সবাই ব্যবহার করি। গ্রামে গঞ্জে কেরোসিন না হলে আলোই জ্বলবে না। শহরেও কেরোসিন তেলের প্রয়োজন হয়। হ্যারিকেন লণ্ঠনের জন্য কেরোসিন তেল চাই, কুপি ডিবের জন্য কেরোসিন তেল চাই, ষ্টোভের জন্য কেরোসিন চাই, উনুন ধরাবার জন্যও অনেক সময় কিছু কেরোসিন তেলের প্রয়োজন হয়। এক কথায়

আমাদের জীবনে কেরোসিন তেল বেশ একটি অতি প্রয়োজনীয় জিনিস হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ডিজেল তেলের সঙ্গেও আজকাল আমরা বেশ পরিচিত হয়ে উঠেছি। বড় বড় মাল বোঝাই লরী চলছে ডিজেল তেলে। গ্রামে গ্রামে জল সেচের জন্য পাম্প চলছে ডিজেল তেলে, কলের লাঙ্গল চলছে ডিজেল তেলে। আজকাল রেলগাড়ীর ইঞ্জিনও অনেক জায়গায় ডিজেল তেলে চলছে। তার মানে ডিজেল তেলও বেশ একটা প্রয়োজনীয় জিনিস হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পেট্রলও এক রকম তেল। মোটর গাড়ী, বড় বড় বাস, হাওয়াই জাহাজ প্রভৃতি এই তেলে চলে। এ সব জিনিস না হলে আমাদের চলে না। সুতরাং পেট্রলও খুব দরকারী জিনিস।

আর এক রকমের তেল আছে, তাকে আমরা বলতে পারি কলে দেবার তেল। ইংরাজীতে বলা হয় লুব্রিকেটিং অয়েল। যন্ত্রপাতির কলকজাগুলো যাতে মসৃণভাবে চলে এবং সর্বদা সচল থাকে তার জন্যই এই তেল কলকজায় দিতে হয়। এই তেল না দিলে যন্ত্রপাতি কিছুদিনের ভেতরই অচল হয়ে যাবে। তাই এই তেলও বেশ প্রয়োজনীয়।

এই যে এত রকম তেলের কথা বললাম, এ সবই এক রকম খনিজ তেল থেকে পাওয়া যায়। এই খনিজ তেলের বৈজ্ঞানিক নাম হল পেট্রোলিয়াম। বর্তমান সভ্যতার একটি উপাদান হল এই তেল।

বর্তমান কালে আমরা আরব দেশগুলোকে তেলের রাজা বলতে পারি। এখানে এত তেল পাওয়া যায় যে এরা সব তেল নিজেদের কাজে লাগাতে পারে না। তাই এখান থেকেই পৃথিবীর অন্যান্য দেশগুলো তেল বা পেট্রোলিয়াম পেয়ে থাকে। কিন্তু তেলের

আসল রাজা বলতে হয় আমেরিকাকে। তবে সে দেশটা এত উন্নত এবং তেলের প্রয়োজন তার এত বেশী যে তাকেও আরব দেশ থেকে তেল নিতে হয়।

আরব দেশেই যে শুধু তেল পাওয়া যায় তা নয়। আরো অনেক দেশেও তেল পাওয়া যায়, তবে পরিমাণে আরব দেশগুলির মত হয়ত হবে না। আমাদের দেশেও কিছু তেল পাওয়া যায়। আসামের ডিগবয় অঞ্চল তেলের জন্য বিখ্যাত। গুজরাটেও কিছু তেল পাওয়া যায়। বিজ্ঞানীদের ধারণা মাটির তলায় আরো অনেক তেল অনেক দেশে আছে। সব দেশেই তাই মাটির তলায় কোথায় কি আছে তা খুঁজে বার করবার একটা চেষ্টা চলছে। আমাদের দেশেও এই রকম একটা চেষ্টা চলছে, অর্থাৎ তেলের জন্য অনুসন্ধান চালানো হচ্ছে। এই অনুসন্ধানের ফলেই বোম্বের সমুদ্র উপকূলে প্রচুর তেলের সন্ধান পাওয়া গেছে।
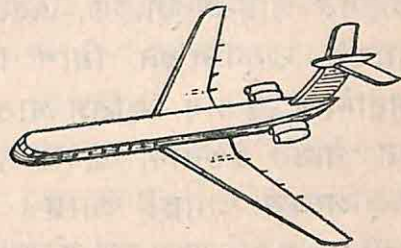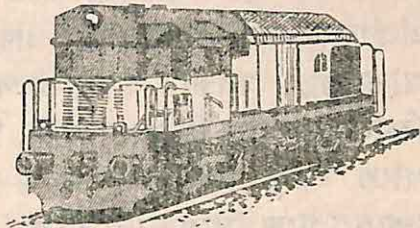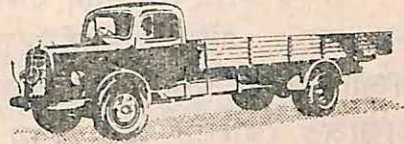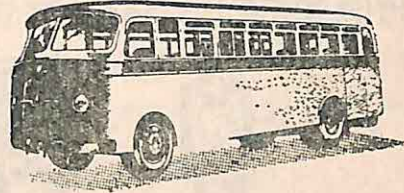
আমাদের বর্তমান সভ্যতার জন্য তেল অতিশয় প্রয়োজনীয়।

বিজ্ঞানীরা মনে করেন আরো অনেক জায়গায়, আমাদের পশ্চিম

বঙ্গের মাটির নীচে বা সমুদ্র উপকূলে তেল পাওয়া যেতে পারে।

বিজ্ঞানীরা বলেন খনিজ তেল অর্থাৎ পেট্রোলিয়াম হল জৈব পদার্থ। জৈব পদার্থ মানে জীবন্ত প্রাণী থেকেই এই তেলের উৎপত্তি হয়েছে। কেমন করে তা হয়েছে সেই কথাই বলছি।

সাড়ে চারশো কোটী বছর আগে আমাদের এই পৃথিবীর জন্ম হয়। এটা বিজ্ঞানীদের অনুমান। সব দেশের সব বিজ্ঞানীরাই এ বিষয়ে প্রায় একমত। সেই সময় পৃথিবীটা ছিল আগুনের গোলার মত গরম। সেই গরমে কোন জিনিসই স্বাভাবিক মুক্ত অবস্থায় থাকতে পারতো না। সব মিলেমিশে একাকার হয়ে থাকতো। এই রকম অবস্থায় অক্‌সিজেন ও স্বাভাবিক অবস্থায় থাকতে পারতো না। অক্‌সিজেন অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে মিশে থাকতো, বিজ্ঞানের ভাষায় যাকে বলা যেতে পারে অক্‌সিজেন অক্‌সাইড হয়ে থাকতো। যেমন হাইড্রোজেনের সঙ্গে মিশে হাইড্রোজেন অক্‌সাইড, কারবনের সঙ্গে মিশে কারবন ডাই-অক্‌সাইড, এবং এই ভাবেই অন্যান্য জিনিসের সাথেও অক্‌সিজেন মিশে ছিল। আজ আমরা আমাদের চারদিকে যে সব জিনিস সাধারনতঃ দেখি, যেমন মাটি, বালি, চুন, পাথর ইত্যাদি, এদের সব কিছুর ভেতর কিছু না কিছু অক্‌সিজেন আছেই আছে। অক্‌সিজেনের কথা বলছি এই জন্য যে অক্‌সিজেন হল জীবন ধারণের প্রধান উপাদান।

আমরা একটা কথা এইখানে বলে রাখি। হাইড্রোজেনের সাথে অক্‌সিজেন মিশলে হয়ে যায় জল। সুতরাং আমরা যাকে

হাইড্রোজেন অক্সাইড বলেছি সেটা কিন্তু আসলে জল। কিন্তু জল হলে কি হবে, ওই গরমে জল জল-হিসেবে থাকতে পারে না, থাকে বাষ্প হয়ে। সুতরাং সেই সময় পৃথিবীটা ছিল আগুনের গোলার মত গরম, আর বাতাস বলে যা ছিল তা হল কারবন ডাই-অক্সাইড এবং বাষ্প। কিছু নাইট্রোজেনও ছিল কারণ নাইট্রোজেন সহজে কারো সঙ্গে মিশ খায় না। আরো দু'চার রকমের গ্যাস হয়ত ছিল, তবে সে সব অন্য কথা।
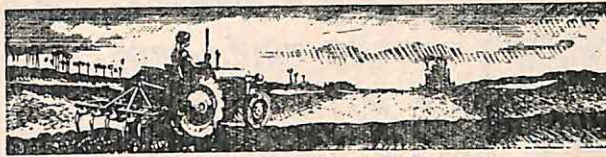
কোটি কোটি বছর এই ভাবেই কেটে গেল। পৃথিবীটা আস্তে আস্তে একটু একটু করে ঠাণ্ডা হতে লাগল। ঠাণ্ডা হতে আরম্ভ করার সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলি কাণ্ড পর পর হয়ে যেতে লাগল। প্রথমে পৃথিবীর ওপর পাতলা একটা স্তর (বালি ও মাটিরই হয়ত হবে) পড়ল। (দুধ জ্বাল দিয়ে উনুন থেকে নামিয়ে রাখলে যে রকম একটা সর পড়ে, অনেকটা সেই রকম আর কি)। পৃথিবীর ওপরটা আস্তে আস্তে জমে শক্ত হ'ল। কিন্তু ভেতরটা নরম ও গরমই রয়ে গেল। (তোমরা কখনো গরম সিঙ্গারা খাবার চেষ্টা করেছো? সিঙ্গারার ওপরটা অল্প অল্প গরম, হাতে সহ্য করা যায়, কিন্তু মুখে তুলে কামড় দিলেই আর রক্ষা নেই, জিভ পুড়ে যাবার উপক্রম। পৃথিবীর অবস্থাও অনেকটা ওই রকম হল মনে কর)।

আমাদের পৃথিবীটা তৈরি হয়েছে বিরানব্বইটি মৌলিক পদার্থ দিয়ে। এই পদার্থগুলির কোনটা গ্যাস, কোনটা তরল

আবার কোনটা কঠিন। গরমে সব জিনিসেরই আয়তন বেড়ে যায়, গ্যাসের আয়তন বাড়ে সবচেয়ে বেশী। তা ছাড়া কঠিন পদার্থ গরমে তরল হয়ে যায়, তরল পদার্থ গ্যাসও হয়ে যেতে পারে। কাজেই পৃথিবীর ওপরের স্তরে আটকা পড়ে ভেতরের পদার্থগুলো গরমে তরল হয়ে, স্ফীত হয়ে, গ্যাস হয়ে বেরিয়ে আসবার জন্য ছটফট করতে থাকে। তার ফলে পৃথিবীর কোন কোন জায়গা ফুলে ফেঁপে উঁচু হয়ে ওঠে, আবার কোন কোন জায়গায় স্তর ভেঙ্গে বাইরে চলে আসে এবং সঙ্গে করে নিয়ে আসে যত সব তরল ও গ্যাসীয় পদার্থ। ফুলে ফেঁপে উঁচু হয়ে পাহাড় পর্বতের সৃষ্টি হয়, আর যেখানে স্তর ভেদ করে বেরিয়ে আসে সেখানে সৃষ্টি হয় আগ্নেয়গিরির। আবার পৃথিবীর কিছু কিছু অংশে পাহাড় পর্বতের সৃষ্টি হওয়ায় অন্য অন্য অংশ-গুলো বসে যায় বা নীচু হয়ে যায়।

ওদিকে আকাশেও অনেক কাণ্ড সুরু হয়ে গেছে। ঠাণ্ডা হবার জন্য আকাশের বাষ্প ঘন হয়ে মেঘ হল, আরো ঠাণ্ডা হয়ে মেঘ গলে বৃষ্টিপাত সুরু হল। সেই বৃষ্টির জল নীচু জায়গা-গুলিতে জমা হতে লাগল, সৃষ্টি হল সমুদ্রের। সেই বৃষ্টির জল পাহাড়-পর্বতের ওপরও পড়ল এবং গড়িয়ে নীচু জায়গায় চলে গেল, সৃষ্টি হল নদীর। এই ভাবেই পৃথিবীটা একটা নতুন আকৃতি লাভ করল।

এত যে সব কথা বললাম এ সবই অনুমানের ওপর নির্ভর করে বলা হয়েছে। কারণ সেই কোটি কোটি বছর আগে আমরা কেউই ছিলাম না। কাজেই ঠিক ঠিক কিভাবে কি হয়েছে আমরা কেউই তা বলতে পারব না। তবে আমাদের অনুমানগুলি যদি যুক্তি যুক্ত হয় তা হলে ধরে নিতে হবে যে হয়ত এই রকম

ভাবেই পৃথিবীর ক্রমবিকাশ ঘটেছে।

এই রকম এক সময় পৃথিবীর বুকে প্রথম প্রাণের স্পন্দন জেগে উঠল। (এর আগে পৃথিবীতে কোনরকম প্রাণী ছিল না, সে কথা বলাই বাহুল্য)। কেমন করে কি হল তা কেউ বলতে পারবে না, তবে প্রথম যারা জীবনের স্পন্দন আনল তারা হল এক প্রকার শ্যাওলা জাতীয় উদ্ভিদ। তোমরা বোধ হয় জান যে উদ্ভিদের প্রধান খাদ্য হল কারবন ডাই-অকসাইড এবং জল। এ দুটো জিনিসই তখন প্রচুর পরিমানে মজুদ ছিল পৃথিবীতে। বাতাস ছিল কারবন ডাই-অকসাইডে ভরা আর জল তো তখন চারিদিকেই থই থই করছে। সুতরাং শ্যাওলা জাতীয় উদ্ভিদের বেঁচে থাকবার কোনই অসুবিধা ছিল না। শ্যাওলা জাতীয় উদ্ভিদ তাই মনের আনন্দে সমুদ্রের ওপর ভেসে ভেসে বেড়াতে লাগল।

শুধু তাই নয়। উদ্ভিদ যেমন খাদ্য হিসাবে কারবন ডাই-অকসাইড গ্রহণ করে, তেমনি অপ্রয়োজনীয় পদার্থ হিসাবে অকসিজেন বর্জন করে। তার মানে উদ্ভিদ বাতাস থেকে কারবন ডাই-অকসাইভ টেনে নেয় এবং সেই বাতাসেই অকসিজেন ছেড়ে দেয়। তখন পৃথিবীর ওপরের আকাশ বেশ ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, কাজেই অকসিজেন অন্য কারো সঙ্গে মিশে আর অকসাইড হচ্ছে না। এমনি করেই বাতাসে একটু একটু করে অকসিজেন জমা হতে লাগল।

বাতাসে অকসিজেন এল তাই অন্য প্রাণীও বেঁচে থাকতে পারে। শুধু যে অকসিজেন এল তা নয়, অন্য প্রাণীর খাদ্যও রয়েছে। কারণ উদ্ভিদ হল প্রাণীর খাদ্য। সুতরাং এক সময় সমুদ্রের বুকে অতিশয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণীর আবির্ভাব হল। প্রাণীর

আবির্ভাব হল বলেই পৃথিবীটা আজো বেঁচে আছে। কেমন করে কি হ'ল একটু বুঝিয়ে বলছি।

উদ্ভিদ বাতাস থেকে কারবন ডাই-অকসাইড টেনে নেয়, কারণ সেটা তার খাদ্য। সুতরাং বাতাসে কারবন ডাই-অকসাইডের পরিমাণ কমতে থাকবে। কমতে কমতে এমন দিন আসতে পারে যখন বাতাসে আর একটুও কারবন ডাই-অকসাইড থাকবে না। তখন তো খাদ্যাভাবে উদ্ভিদরাই মারা যাবে। কিন্তু প্রাণীর আবির্ভাব হল বলে সে রকম কিছু আর ঘটতে পারলো না। কারণ প্রাণী নিশ্বাস ফেলার সময় বাতাসে কারবন ডাই-অকসাইড ছেড়ে দেয়। ফলে একদিক দিয়ে যেমন কারবন ডাই-অকসাইডের পরিমাণ কমছে, অন্য দিক দিয়ে কারবন ডাই-অকসাইডের পরিমাণ তেমনি বাড়ছে। তার মানে বাতাসে কারবন ডাই-অকসাইডের পরিমাণ কমছেও না, বাড়ছেও না, ঠিক ঠিক থেকে যাচ্ছে।

ঠিক এই ভাবেই বাতাসে অকসিজেনের পরিমাণ বাড়ছেও না,কমছেও না। কারণ উদ্ভিদ বাতাসে অকসিজেন ছেড়ে দিচ্ছে, প্রাণী বাঁচবার জন্য বাতাস থেকে অকসিজেন টেনে নিচ্ছে। এই ভাবে উদ্ভিদ ও প্রাণী মিলে মিশে একটা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে নিয়েছে যার ফলে বাতাসে কারবন ডাই-অকসাইড এবং অকসিজেন চিরকাল একই পরিমাণে থাকছে। এটা যদিও প্রায় তিরিশ কোটি বছর আগেকার কথা, আজো এই ব্যবস্থার কোন পরিবর্তন হয়নি বলে মনে হচ্ছে।

চিরস্থায়ী ব্যবস্থার ফলে লাখো লাখো কোটি কোটি উদ্ভিদ গজাতে লাগল এবং কোটি কোটি প্রাণীও জন্মাতে লাগল।
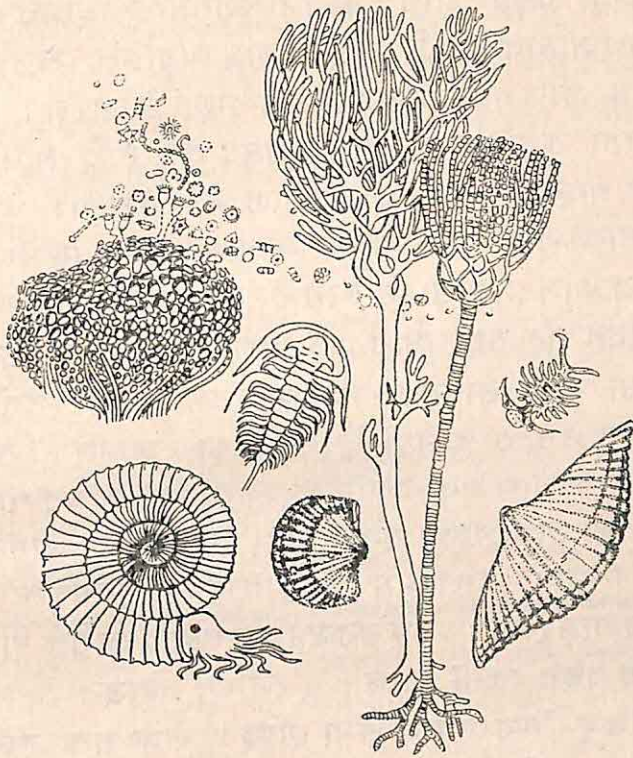
প্রথম জীবনের সাড়া জেগেছিল জলে। শ্যাওলা জাতীয় গাছ এবং পোকা জাতীয় প্রাণী। (অনেক বড় করে দেখানো হয়েছে)।

প্রথম জীবনের সূত্রপাত হয় জলে—শ্যাওলা জাতীয় উদ্ভিদ আর জলের পোকা জাতীয় প্রাণী। এরা কোটিতে কোটিতে জন্মাল আবার কোটিতে কোটিতে মরলও। এদের মৃতদেহগুলো সমুদ্রের তলায় গিয়ে জমা হতে লাগল। সেইখানেই এরা পচতে লাগল, গলতে লাগল। এই গলিত পদার্থই হল পেট্রোলিয়াম। তাহলে বলা যেতে পারে যে পেট্রোলিয়ামের জন্ম হয়েছিল প্রায়

তিরিশ কোটি বছর আগে (এটা বিজ্ঞানীদের হিসেব)। প্রথম প্রথম হয়ত সামান্য একটু পেট্রোলিয়াম হয়েছিল, কিন্তু প্রতিদিন, প্রতি মাসে, প্রতি বছরে এর পরিমাণ বাড়তেই লাগল।

আরো কথা আছে। সেই সময় ঝড় বৃষ্টি লেগেই ছিল। বৃষ্টির জল পাহাড় থেকে গড়িয়ে সমুদ্রে এসে পড়তো। এই জলের স্রোতে স্রোতে বহু কাদা-মাটি-বালি-পাথর ভেসে ভেসে আসতো এবং সমুদ্রে এসে সেগুলো থিতিয়ে তলায় গিয়ে জমা হত। স্তরে স্তরে বছরের পর বছর ধরে এই রকম পলিমাটি সমুদ্রের তলায় গিয়ে জমা হতে লাগল। সমুদ্রের তলায় যে পেট্রোলিয়াম জমেছে তার ওপরও পলিমাটির স্তর পড়তে লাগল। কালক্রমে ওপরের জলের চাপে এবং তলার মাটির গরমে এই সব পলিমাটির স্তর জমে শক্ত হয়ে পাথর হয়ে যেত। বিজ্ঞানীরা এদের বলেন পাললিক শিলা। কালক্রমে পেট্রোলিয়াম পাললিক শিলার নীচে চাপা পড়ে গেল। এই রকম কিছু ঘটতে কয়েক হাজার বা কয়েক লক্ষ বছর কেটে গেছে। (আজো সমুদ্রের তলায় রোজ কিছু না কিছু জৈব পদার্থ জমা হচ্ছে। লক্ষ লক্ষ বছর পরে এ গুলো হয়ত পেট্রোলিয়াম হয়ে দেখা দেবে।)

পেট্রোলিয়াম হল তেল জাতীয় পদার্থ। তেল আবার জলের চাইতে হাল্কা। তাই তেল সব সময় জলের ওপর ভেসে উঠবার চেষ্টা করে। পেট্রোলিয়ামও তাই সমুদ্রের ওপরে ভেসে উঠবার চেষ্টা করবে। কিন্তু তার ওপর পাললিক শিলা থাকার জন্য তা পারে না। তাই চারদিকে ছড়িয়ে পড়বার চেষ্টা করে।

সাধারণতঃ পাললিক শিলা খুব শক্ত এবং দুর্ভেদ্য হয় না। তার মানে তার ভেতর দিয়ে গ্যাস বা তরল পদার্থ চুইয়ে চুইয়ে যেতে পারে। ব্লটিং পেপার যেমন জল বা কালি শুষে নিতে পারে,

অনেক পাললিক শিলা অনেকটা সেই রকম ভাবে পেট্রোলিয়াম শুষে নিতে পারে। এই রকম শিলার ভেতর দিয়ে পেট্রোলিয়াম চুইয়ে চুইয়ে চলতে থাকে। এই ভাবেই সমুদ্রের তলার পেট্রো-লিয়াম অনেক দূর দূর দেশে চলে যায়।
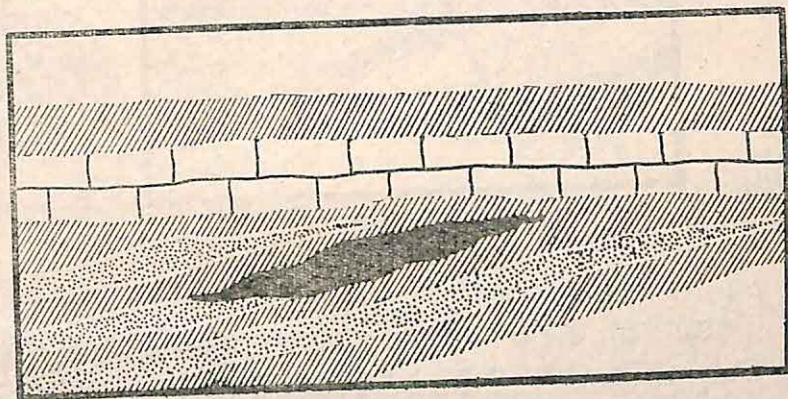
মাটির তলায় তেল চুঁইয়ে চুঁইয়ে চলতে থাকে। কোন কঠিন শিলায় বাধা পেলে সেইখানেই জমা হতে থাকে।

এইভাবে চলতে চলতে যদি কোন শক্ত ও দুর্ভেদ্য পাথরে বাধা পায় তা হলে সেই খানেই পেট্রোলিয়াম জমা হতে থাকে। আর এক রকমের শিলা বা পাথর আছে, তার নাম আগ্নেয় শিলা। পৃথিবীটা যখন খুব গরম ছিল তখন সব কিছুই তরল অবস্থায় ছিল। এই তরল পদার্থ ঠাণ্ডা হলে জমে শক্ত পাথর হয়ে যায়। একেই বলা হয় আগ্নেয় শিলা। আগ্নেয় শিলাগুলি সাধারণতঃ খুব কঠিন এবং দুর্ভেদ্য হয়। এই আগ্নেয় শিলার দ্বারা বাধা পেলে পেট্রোলিয়াম চুইয়ে চুইয়ে আর কোথাও যেতে পারে না। অতএব সেই খানেই জমা হতে থাকে।
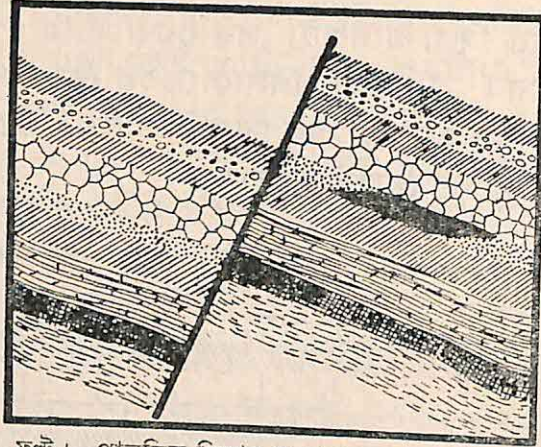
ফল্ট। পাললিক শিলার স্তর ভেঙ্গে গেলে ফল্টের সৃষ্টি হয়। সেখানে তেলও জমা হতে থাকে।

আবার অনেক জায়গায় পাললিক শিলার স্তর ভেঙ্গে যায়। একে বিজ্ঞানীরা বলেন ফল্ট। সুতরাং পেট্রোলিয়ামও চুইয়ে চুইয়ে যেতে যেতে থেমে যায়। অতএব সেখানেও পেট্রোলিয়াম জমা হতে থাকে। অনেক সময় আবার শিলার ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে চুইয়ে চুইয়ে মাটির ওপরও চলে আসে। বিজ্ঞানীরা একেই বলেন সীপেজ।

এই সীপেজের পেট্রোলিয়ামই মানুষ প্রথম ব্যবহার করে। তাও কয়েক হাজার বছর আগে।
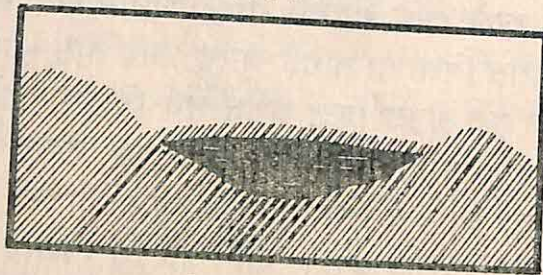
সীপেজ। মাটির তলার তেল চুঁইয়ে চুঁইয়ে মাটির ওপরে উঠে আসে এবং একটি পুকুরের সৃষ্টিও করতে পারে।

পেট্রোলিয়ামের প্রথম খনি
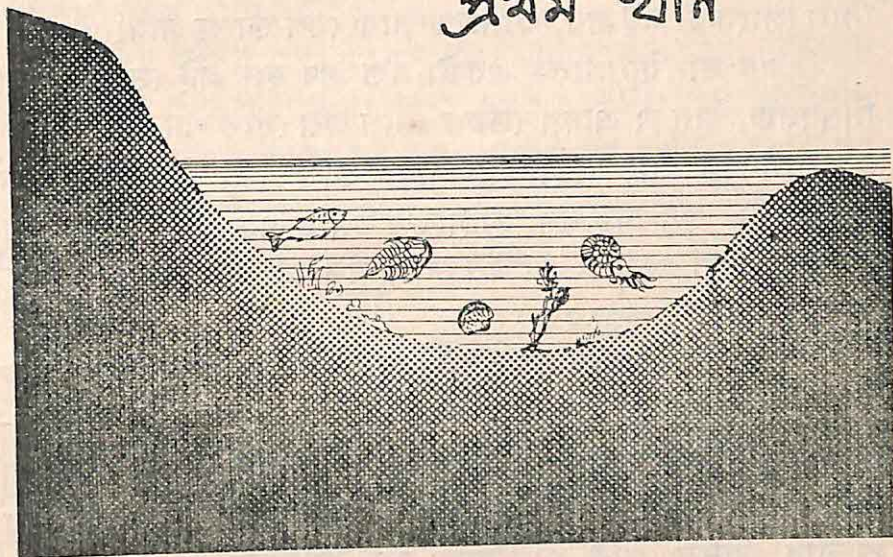
তেল বা পেট্রোলিয়াম জিনিসটা ঠিক জলের মত তরল নয়, আবার কাদার মত ঘনও নয়। পেট্রোলিয়াম হল এদুটোর মাঝামাঝি। অর্থাৎ অনেকটা ঝোলা গুড়ের মত। পাললিক শিলার ভেতর দিয়ে চুইয়ে চুইয়ে পেট্রোলিয়াম এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চলে যেতে পারে। চুইয়ে চুইয়ে মাটির ওপর এসে পড়তে পারে। মাটির ওপর এসে পড়লে এরা সেইখানেই পুকুর বা ডোবার মত জমা হয়। একেই বলা হয় সীপেজ। সীপেজের তেল কোথাও কোথাও শুকিয়ে যেত এবং একটি শক্ত কালো পদার্থ সেইখানে পাওয়া যেত। কিন্তু শক্ত

হলে কি হবে, একটু গরম করলেই এগুলো নরম হয়ে যেত, বেশী তাপ লাগলেই গলে চটচটে আঠার মত হয়ে যেত এবং ঠাণ্ডা লাগলেই আবার আগের মত শক্ত হয়ে যেত। পিচ, বিটুমেন, অ্যাসফালট, প্রভৃতি অনেক নাম এদের আছে। আগেকার দিনে লোকেরা এই সব জিনিসগুলিকে বেশ কাজে লাগাতো।

পিচ বা বিটুমেনের একটা মস্ত গুণ হল এই যে এরা জল নিরোধক, অর্থাৎ এদের ভেতর দিয়ে জল যেতে পারে না। এই জন্য নৌকার এবং জাহাজের তক্তার ফাঁকগুলো পিচ দিয়ে বন্ধ করা হ'ত। শুধু তাই নয়, জাহাজের তলায় এবং ভেতরেও পিচের আস্তর দেওয়া হত। (প্রাচীন কালে বড় বড় সমুদ্রগামী জাহাজ কাঠ দিয়ে তৈরি করা হত)।

আমরা আমাদের ঘর বাড়ী তৈরি করবার সময় ইটের পরে ইট সাজিয়ে চুণ-সুরকির গাঁথুনি সাধারণতঃ দিয়ে থাকি। আজ-কাল সিমেন্টের গাঁথুনিও দেওয়া হয়। প্রাচীন কালে লোকেরা পিচ বা বিটুমেনের গাঁথুনি দিত। প্রাচীন সভ্যতার যে সব আভাষ আমরা পাই তা বোধ হয় ব্যাবিলনকে ঘিরে গড়ে উঠেছিল। ব্যাবিলন হ'ল আরব দেশের কাছে। দক্ষিণ আমেরিকার ইনকা সভ্যতা বোধ হয় তার চাইতেও প্রাচীন। এই সব প্রাচীন সভ্যতার অনেক নিদর্শন পাওয়া গেছে। এই সব নিদর্শন থেকে মনে হয় পিচ বা বিটুমেনের ব্যবহার সে যুগের লোকেরা জানতো। তা ছাড়া যে জিনিসটা সহজেই পাওয়া যায় তা লোকে নানা রকম কাজে লাগাবে এটা তো সোজা কথা।

সীপেজের তেলের আরো একটা ব্যবহার ছিল ওষুধ হিসেবে। শুনতে খুব অবাক লাগবে যে আমেরিকার আদিম আদিবাসীরা, মিশরের লোকেরা, চীন দেশের লোকেরা ওষুধ

হিসাবে এই তেল খেতো এবং খোস-পাঁচড়ায় এই তেলের মলম লাগাতো। এ সব হল প্রাচীন যুগের কথা। মধ্য যুগেও, অর্থাৎ চার পাঁচশো বছর আগেও বিলেতের লোকেরা এই তেল খেতো এরকম কথাও শোনা যায়। (এখনও পেট্রোলিয়াম থেকে অনেক ডাক্তারী ওষুধ তৈরি হয়।)

মাটির তলায় তেল বা পেট্রোলিয়াম পাওয়া যেতে পারে তা মানুষ টের পায় দু তিনশো বছর আগে। মাটি খুড়ে তেল বার করবার চেষ্টাও তাহলে সেই সময় থেকে হয় বলা যেতে পারে। তবে অনেকে মনে করেন দু হাজার বছর আগেও চীন দেশের লোকেরা মাটি খুঁড়ে তেল বার করতো। তবে সেই সময়কার বিবরণ খুব বেশী পাওয়া যায় না।

অন্যান্য দেশে, ইউরোপে এবং আমেরিকায় তেলের ব্যবহার সুরু হয় প্রায় এক দেড়শো বছর আগে। বিলেতের একজন বিজ্ঞানী সাঁপেজের তেল বিশুদ্ধ করে তিন রকম জিনিস তৈরি করেন। এক রকম পাতলা তেল, এক রকম ভারী তেল এবং মোমবাতি তৈরি করবার মত এক রকম ঘন পদার্থ। পাতলা তেল দিয়ে আলো জ্বালানো হত, ভারী তেলটা ব্যবহার করা হত যন্ত্র-পাতি মসৃণ রাখার জন্য এবং ঘন পদার্থটা দিয়ে সত্যি সত্যি মোমবাতি তৈরি করা হত। এ হল ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দের কথা অর্থাৎ একশো তিরিশ বছর আগেকার কথা। সেই সময় এই তেলটা পাওয়া যেত সাঁপেজ থেকে।

এই সাঁপেজের তেল কিন্তু খুব বেশীদিন পাওয়া গেল না। কত হাজার বছর ধরে একটু একটু করে চুইয়ে চুইয়ে সাঁপেজ তৈরি হয়েছে তার কোন হিসেব নেই। তার ওপর কিছু তেল শুকিয়ে পিচ বা বিটুমেন হয়ে যায়। বাকী তেলটুকু ক্রমাগত

টেনে নিতে থাকলে সীপেজের তেল ফুরিয়ে যেতে আর কতক্ষণ লাগে? তাই কয়েক বছরের ভেতরই সীপেজের তেল ফুরিয়ে গেল, নিঃশেষ হয়ে গেল।

সেই সময় স্কটল্যাণ্ডে একটা শেলের পাহাড় আবিস্কৃত হল। আবিস্কৃত হল মানে পাহাড়টা সেইখানেই ছিল তবে টের পাওয়া গেল যে এই পাহাড়টা শেল দিয়ে তৈরি। শেল হল এক রকম পাললিক শিলা (কাদা জমে শক্ত হয়ে এই শিলা হয়) যার ভেতর দিয়ে পেট্রোলিয়াম চুইয়ে চুইয়ে যেতে পারে। এক কথায় বলা যেতে পারে শেল হল এক রকম তেলবাহি শিলা। বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখলেন যে এই পাহাড়ের টুকরো টুকরো পাথর গুলো আগুনে গরম করলে তার ভেতর থেকে তেল পাওয়া যায়। বিজ্ঞানীরা আরো টের পেলেন যে মাটির তলা থেকে খুঁড়ে শেলের টুকরো বের করলে তা থেকে আরো বেশী তেল পাওয়া যায়। উৎসাহী লোকেরা সঙ্গে সঙ্গে স্কটল্যাণ্ডে একটা কারখানা স্থাপন করে বসলেন। এইটেই বোধ হয় তেলের প্রথম কারখানা।

আমেরিকায় কিন্তু প্রথম প্রথম তেল জিনিসটাকে জঞ্জালের সামিল বলে মনে করা হত। আমেরিকায় তখন নতুন উপনিবেশ বসেছে। ইউরোপ থেকে বহুলোক সেখানে গিয়ে বসবাস করতে আরম্ভ করেছে। নতুন দেশ, নতুন উৎসাহ নতুন উদ্যম। সবাই উঠে পড়ে লেগে গেছে নতুন করে গড়ে তুলতে হবে, নতুন জীবন আরম্ভ করতে হবে।

কোন জায়গায় স্থায়ী ভাবে বসবাস করতে হলে সকলের আগে প্রয়োজন হয় পানীয় জলের। উপনিবেশগুলি সমুদ্রের ধারে ধারেই হয়েছিল কিন্তু সমুদ্রের জল তো আর পান করা চলে না। তাই পানীয় জলের জন্য কুয়ো খুঁড়তে হত। অনেক

সময় এবং অনেক জায়গায় বহু কুয়োতে নোনা জল এসে হাজির হত। এর জন্য একটু অসুবিধা হলেও ওরা হতাশ হত না। অন্য জায়গায় পানীয় জলের জন্য কুয়ো খুঁড়তে হত, কিন্তু নোনা জলের কুয়োটিকে তারা অকেজো বলে ছেড়ে দিত না। এই নোনা জল থেকে লবণ তৈরি করা হত। তবে মাঝে মাঝে অনেক জায়গায় অনেক কুয়োতে নোনা জলের বদলে তেল এসে হাজির হত। তখন আর ওদের আফশোষের সীমা থাকতো না। কুয়ো খোঁড়ার পরিশ্রমটাই বৃথা হল মনে করত। তারা সে কুয়োটাকে বাদ দিয়ে অন্য জায়গায় আবার কুয়ো খুঁড়তো।

কুয়োতে তেল আসে দেখে এক যুবকের মাথায় চমৎকার এক বুদ্ধি এসে গেল। সে বিলেত থেকে আমেরিকায় এসেছে ভাগ্য অন্বেষণে। এখানে কিছু করতে হবে এবং সেই কর্মের ভেতর দিয়েই বড় হতে হবে। সে খোঁজ খবর নিয়ে জানতে পারল যে এই তৈলাক্ত জিনিসটা আমেরিকার আদিম অধিবাসীরা ওষুধ হিসেবে খেয়ে থাকে। সে তাই এই তেল নানা রকম শিশিতে ভর্তি করে, রং বেরংএর লেবেল এটে গ্রামে গ্রামে হাটে বাজারে বিক্রী করা সুরু করে দিল। কিন্তু এতেও কুয়োর তেল ফুরোতে চায়না। তখন তার মাথায় আর একটা বুদ্ধি এল। সে কুয়োর তেলকে জ্বালিয়ে দেখবার চেষ্টা করল আলো পাওয়া যায় কি না। রাত্রিবেলা তো আলোর দরকার সকলেরই হবে।

আগুন লাগাতেই এই তেল দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। তা দেখে সকলেই বেশ ঘাবড়ে গেল। ব্যপারটা খুব সুবিধার হবে বলে মনে হল না। কারণ আলোর চাইতে ধোঁয়া এত বেশী হ'ল যে চারদিক প্রায় অন্ধকার হয়ে গেল। সুতরাং ঘরে আলো জ্বালাবার জন্য এই তেল কেউই পছন্দ করবে না।

যুবকটি কিন্তু হাল ছাড়ল না। সে এই আলকাতরার মত ঘন কালো তেল নিয়ে নানা রকম পরীক্ষা আরম্ভ করে দিল। অবশেষে এই তেলকে সেদ্ধ করে এমন একটা স্বচ্ছ তেল বার করল যা বেশ সহজেই জ্বলে, চমৎকার আলো হয়, আর একটুও ধোঁয়া হয় না।

এই তেলটা সকলেরই বেশ পছন্দ হল। দেখতে দেখতে এই তেলের চাহিদাও বেশ বেড়ে গেল। চাহিদা বেড়ে যাওয়াতে কুঁয়োর তেলও ফুরোতে লাগল। তখন বাধ্য হয়ে নতুন নতুন কুঁয়োর খোঁজে অনেকে চারিদিকে ঘোরাঘুরি করতে লাগল।

কিন্তু সে রকম কুঁয়োর সন্ধান আর সহজে পাওয়া গেল না। এতদিন জলের জন্য কুঁয়ো খোঁড়া হত, তাতে অনেক সময় এসে পড়তো তেল। এখন তেলের জন্য কুঁয়ো খোঁড়া হচ্ছে কিন্তু পাওয়া যাচ্ছে জল। কিন্তু হতাশ হলে তো চলবে না। তেলের জন্য আরো গভীর করে কুঁয়ো খুঁড়তে হবে। কিন্তু সেটা একজনের কাজ নয়।

সকলে গিয়ে তখন ক্যাপটেন ড্রেককে গিয়ে ধরল একটা উপায় করে দেবার জন্য। তিনিই ছিলেন ওদের মধ্যে মাতব্বর। তাছাড়া নানা রকম উৎসাহ তিনি ওদের দিতেন। ক্যাপটেন ড্রেক কিন্তু কোন জাহাজের বা সৈন্য দলের ক্যাপটেন ছিলেন না। তিনি ছিলেন রেল কোম্পানীর গার্ড। বিলেতের লোকেরা আমেরিকায় এসে যাতায়াতের সুবিধার জন্য রেলের লাইন পেতেছিল এবং রেলগাড়ী চালাবার ব্যবস্থাও করেছিল। ক্যাপটেন ড্রেক ছিলেন সেই রেলগাড়ীর গার্ড। তিনি সব সময় গার্ডের পোশাক পরে থাকতেন, তাই সকলে তাকে ক্যাপটেন বলে ডাকতো, খাতির করতো, সম্মান করতো।
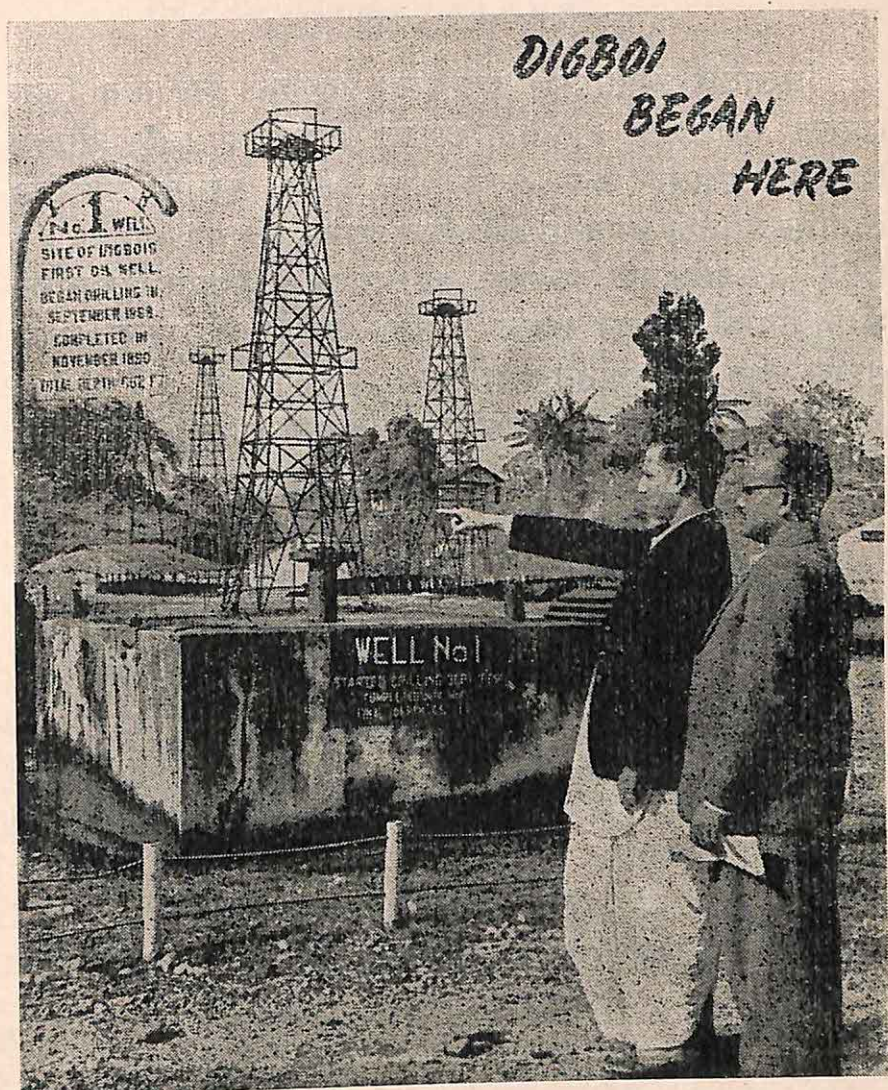
ভারতের প্রথম তেল কূপ ঃ আসামের ডিগবয় অঞ্চলে এই কূপটির খনন কাজ আরম্ভ হয় ১৮৮৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এবং শেষ হয় ১৮৯০ সালের নভেম্বর মাসে। ৬৬২ ফিট নীচেই তেল পাওয়া যায়। এই অঞ্চলটি ছিল ঘন জঙ্গলে ভরা, দুর্গম এবং অজানা ; জায়গাটার তখন কোন নামও ছিল না। এইটিই ভারতের প্রথম তেল কূপ। এই কূপটির সঙ্গে ডিগবয় নামটিও চালু হল। এর আগে ১৮৬৬ সাল থেকে এই অঞ্চলে তেলের জন্য অনুসন্ধান চালানো হয়। ফটো—আসাম অয়েল কোম্পানীর সৌজন্যে।

সকলের অনুরোধে অবশেষে একদিন ক্যাপটেন ড্রেক তেলের জন্য খনি খুঁড়বার আদেশ দিলেন। সেই আদেশ অনুসারে তেলের জন্য প্রথম খনি খোঁড়া হয় আমেরিকার পেনসিলভানিয়া প্রদেশের টিটুসভিল নামক এক জায়গায়। এই টিটুসভিল এখন মস্ত বড় শহর হয়ে গেছে। এখানে উনসোত্তর ফীট নীচেই তেলের সন্ধান পাওয়া গেল। সেটা হ'ল ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দ—খুব বেশী দিনের কথা নয়।

এইটেই হ'ল পেট্রোলিয়ামের প্রথম খনি। সেই দিন থেকেই শুরু হল পেট্রোলিয়ামের জয় যাত্রা।

তেলের সন্ধানে
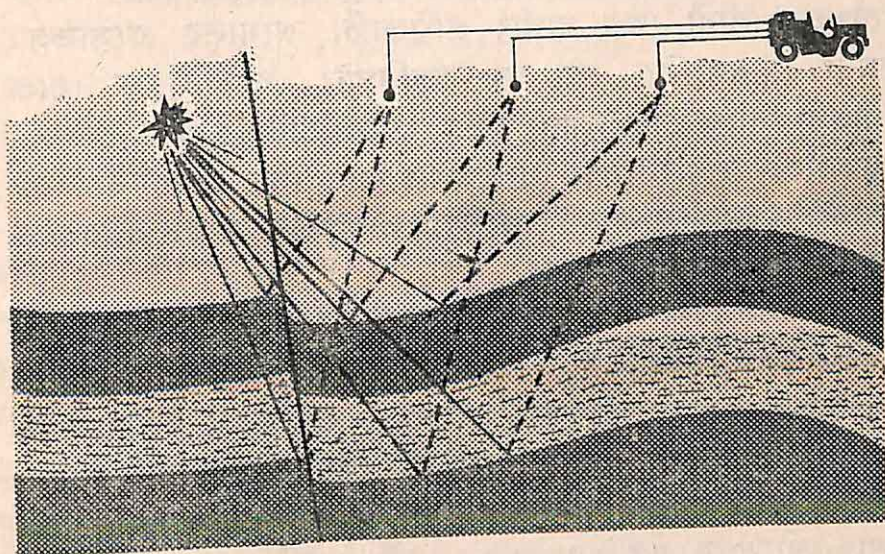
তেলের ব্যবহার অনেক আগে থেকেই ছিল, ওষুধ এবং মলম হিসাবে। আলো জ্বালবার জন্য পেট্রোলিয়ামের ব্যবহার শুরুহলে, এর চাহিদা অনেক পরিমানে বেড়ে গেল। ক্যাপটেন ড্রেক প্রথম তেলকূপ খুঁড়লেন, তারপর আরো অনেক তেলকূপ খোঁড়া হল। কিন্তু তাতেও চাহিদা মিটল না। তখনো বৈদ্যুতিক আলো আবিস্কার করা হয়নি। সুতরাং আলো জ্বালবার জন্য তেলের প্রয়োজন বাড়তেই লাগল। যারা আগে রেড়ির তেল বা অন্য কোন

তেলের বাতি জ্বালাতো তারাও খনিজ তেল অর্থাৎ পেট্রোলিয়ামের দিকে ঝুঁকে পড়ল। তা ছাড়া তার আগে থেকেই জায়গায় জায়গায় কল কারখানা স্থাপিত হয়েছে, ষ্টীম ইঞ্জিন আবিস্কৃত হয়েছে, রেলগাড়ীও চলছে। এই সব কারখানার এবং রেলগাড়ির ইঞ্জিনের কলকব্জা চালু রাখবার জন্য, মসৃণ রাখবার ভারী তেল অর্থাৎ লুব্রিকেটিং অয়েলের প্রয়োজন। আর মোমবাতির মত যে জিনিসটা পেট্রোলিয়াম থেকে পাওয়া যায় তা-ও নানা রকম কাজে ব্যবহৃত হতে লাগল। সুতরাং তেলের চাহিদা বেড়ে গেল এবং দিন দিনই বাড়তেই লাগল। অতএব আরো তেল চাই, তার মানে আরও নতুন তেল কূপ খুঁড়তে হবে।

প্রথম প্রথম সীপেজের কাছাকাছি তেল কূপ খোঁড়া হত এবং তেলও পাওয়া যেত। অনেক জায়গায় চল্লিশ-পঞ্চাশ হাত খুঁড়লেই তেল পাওয়া যেত। কোথাও বা আরো গভীর ভাবে কুয়ো খুঁড়তে হত—একশো দুশো হাত কিম্বা তার চাইতেও বেশী মাঝে মাঝে আবার অনেক খোঁড়াখুঁড়ি করেও তেল পাওয়া যেত না। সীপেজে তেল আছে অথচ মাটি খুঁড়ে তেল পাওয়া যাচ্ছে না, এই রকম অনেক ঘটনা ঘটল। এই রকম ঘটনা তখনকার দিনের মানুষকে বেশ ভাবিয়ে তুলেছিল। এরকম হবার কারণটা অবশ্য তেমন বিশেষ কিছু নয়। বহুদূর থেকে তেল মাটির ভেতর দিয়ে চুইয়ে চুইয়ে সেখানে এসে সীপেজ করেছে, অথবা সীপেজের তলায়ই হয়ত তৈল-বাহী স্তর ছিল, কিন্তু ভূমিকম্প বা অন্য কোন কারণে এখন হয়ত সেই স্তর অন্য কোথাও সরে গেছে, অথবা তৈল-বাহী পাথরের ভেতর দিয়ে সব তেল অনেক দূরে চলে গিয়ে কোন ফলটের ধারে গিয়ে হয়ত জমা
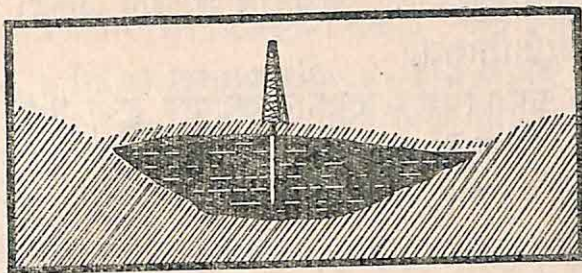
প্রথমে সীপেজের কাছাকাছি তেলকূপ খনন করা হত।

হয়েছে। যে কারণেই হোক, মাঝে মাঝে মাটি খুঁড়লেও তেল পাওয়া যেত না।

বিজ্ঞানীরা চুপ করে বসে রইলেন না। কেন এরকম হয় তার কারণটা জানতে হবে। তাঁরা নানা ভাবে নানা রকম পরীক্ষা এবং গবেষণা শুরু করে দিলেন। এই সব পরীক্ষা এবং গবেষণার ফলে তাঁরা জানতে পারলেন মাটির তলায় কেন এবং কি ভাবে তেল আটকে থাকে। সুতরাং মাটির তলা থেকে তেল পেতে হলে কি রকম পাথরের সন্ধান করা দরকার তা তাঁরা জানতে পারলেন। তাই যেখানে সেখানে তেলের জন্য কূপ না খুঁড়ে তেল বিশেষজ্ঞগণ মাটি ও পাথর পরীক্ষা করতে লেগে গেলেন। এবং যেখানে তৈল-বাহী পাথরের সন্ধান পেতেন সেই খানেই তেলের জন্য কূপ খুঁড়তে নির্দেশ দিতেন।

ইতিমধ্যে, মোটর গাড়ী আবিস্কৃত হয়েছে। এরোপ্লেনও আবিস্কার করা হল তারপরে। সুতরাং তেলের প্রয়োজন হঠাৎ বেড়ে গেল। তাই তেলের সন্ধানে বিষেজ্ঞগণ দিকে দিকে, দেশে দেশে ছুটাছুটি করতে লাগলেন। কোথাও তেল পেলেন, কোথাও পেলেন না। কেন পেলেন না তার কারণ অনুসন্ধান করে করে

বিজ্ঞানীরা মোটামুটি তেল অনুসন্ধান করবার একটা কার্য্যকরী পদ্ধতি বের করে নিলেন।

ব্যাপক ভাবে তেল অনুসন্ধান করবার জন্য সকলের আগে বিভিন্ন জায়গার ফটোগ্রাফ নেয়া দরকার। এই সব ফটোগ্রাফ ভাল করে পরীক্ষা করে জমি বা পাহাড়ের স্তর ও চেহারা দেখে বুঝতে পারা যাবে তেল পাবার সম্ভাবনা কোথায় কোথায় আছে। এরোপ্লেন তৈরী হবার ফলে দুর্গম জায়গার ফটোগ্রাফ নেয়াও বেশ সহজ হয়ে গেছে। এরোপ্লেন থেকেই এই সব জায়গার ফটোগ্রাফ নেওয়া যায়। এই সব ফটোগ্রাফ দেখে বিজ্ঞানীরা মোটামুটি একটা আন্দাজ করে নিতে পারেন। তারপর সেই সব জায়গায় গিয়ে মাটি পাথর পরীক্ষা করা দরকার এবং তার পরের কাজ হল তেলের জন্য কূপ খোঁড়া।

অনেক জায়গায় মাটির অনেক নীচে তৈল-বাহী পাথরের স্তর রয়েছে। মাটির ওপরের ফটোগ্রাফ দেখে এই সব স্তরের সন্ধান পাওয়া যায় না। তা ছাড়া সেই তৈল-বাহী স্তরের ওপরে হয়ত এমন শক্ত আগ্নেয় পাথরের কয়েকটা স্তর রয়েছে যে সব স্তর ভেদ করে সেখানকার তেল কোন দিনই চুইয়ে চুইয়ে ওপরে উঠবে না। এই সব তৈল-বাহী স্তরের সন্ধান নেবার জন্যও বিজ্ঞানীরা উপায় বার করেছেন। উপায়টা খুব সহজ না হলেও সেরকম জটিল কিছু নয়।

আমাদের যখন অসুখ করে তখন আমরা ডাক্তার ডাকি। ডাক্তার এসে স্টেথোস্কোপ দিয়ে আমাদের বুক পিঠ পরীক্ষা করেন। অঙ্গুল দিয়ে টোকা দিয়েও বুক পিঠ পরীক্ষা করেন। স্টেথোস্কোপ বুকে লাগালেই নানা রকম শব্দ শুনতে পান। এই সব শব্দ শুনে তিনি বুঝতে পারেন বুকের ভেতর সর্দি জমেছে

কি না, জমে থাকলে সেটা তরল না শুকনো, সর্দি ছাড়া অন্য কিছু সেখানে আছে কি না, ফুসফুস ঠিক মত কাজ করছে কি না, এই সব এবং আরো কত কি। আঙ্গুল দিয়ে টোকা দিয়েও নানা রকম শব্দ তিনি টের পান এবং এই সব শব্দ থেকে তিনি বুঝতে পারেন আমাদের বুকের ভেতর কি হচ্ছে। তেল বিজ্ঞানীরাও অনেকটা এই পদ্ধতিতে কাজ করেন। মাটির তলার শব্দ তাঁরা শুনবার চেষ্টা করেন এবং পৃথিবীর বুকের স্পন্দন শুনে তাঁরা বুঝতে পারেন মাটির নীচে তেল আছে না শুধু বালি ও পাথর আছে। তেল-বিজ্ঞানীরা কিন্তু তাই বলে ডাক্তারী স্টেথোস্কোপ ব্যবহার করেন না।

তেল বিজ্ঞানীদের পদ্ধতিটা একটু অন্য ধরনের। প্রথমে তাঁরা একটা জায়গা বেছে ঠিক করে নেন। সেখানে বেশ একটা গভীর গর্ত খুঁড়ে বেশ খানিকটা ডিনামাইট বা ডিনামাইট জাতীয় কোন বিস্ফোরক পদার্থ পুতে দেন। এই ভাবে মাটির তলায় একটা বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। এই বিস্ফোরণের ফলে মাটির তলায় বেশ একটা স্পন্দনের সৃষ্টি হয়। এই স্পন্দন মাটির তলায় বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। মাটির তলায় নানা রকম কাদা-মাটি-বালি-পাথরের স্তর আছে, আগ্নেয় শিলার স্তর আছে, পাললিক শিলারও স্তর আছে। এই সব স্তরে বিস্ফোরণের স্পন্দন এসে ধাক্কা লাগায় এবং ধাক্কা খেয়ে আবার ফিরে যায় প্রতিধ্বনি হয়ে। মাটিতে কান পেতে এই সব প্রতিধ্বনি আমরা অবশ্য শুনতে পাব না, তবে যন্ত্রের সাহায্যে বিজ্ঞানীরা তা টের পেয়ে যান। এক এক রকম জিনিস থেকে এক এক রকম প্রতিধ্বনি আসে এবং এই প্রতিধ্বনি গুলিকে বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারেন মাটির তলায় কি রকমের পাথরের স্তর

আছে এবং সেগুলো মাটির কত নীচে আছে। এই ভাবেই তেল এবং তৈল-বাহী পাথরের স্তরের সন্ধান পাওয়া যায়।

তৈল-বাহী পাথরের স্তরের সন্ধান পাওয়া গেলে বিজ্ঞানীরা হিসেব করে বলে দেন কোথায় তেল পাওয়া যেতে পারে। পাওয়া যাবেই এমন কথা কিন্তু কেউ বলেন না। সতি সত্যি তেল পাওয়া যাবে কি না সে কথা জানতে হলে সেখানে রীতিমত
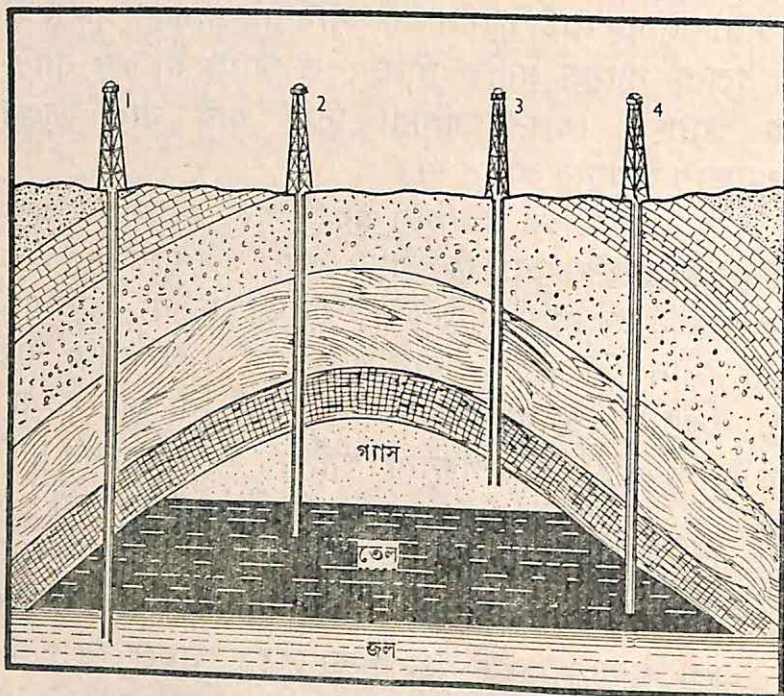
বিজ্ঞানীরা বলে দিতে পারেন মাটির তলায় কোথায় তেল পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু কূপ খুঁড়লেই যে তেল পাওয়া যাবে তা বলেন না। কারণ 1 নম্বর কূপে তেল হয়ত পাওয়া যাবে না, 3 নম্বর কূপে হয়ত শুধু গ্যাস পাওয়া যাবে ; তবে 2 ও 4 নম্বর কূপে তেল পাওয়া যেতে পারে।

কূপ খুঁড়ে দেখতে হয় সেখানে তেল আছে কি না। অনেক সময় তেল পাওয়া যায়, আবার অনেক সময় তেলের বদলে গ্যাস পাওয়া যায় এবং অনেক সময় অনেক চেষ্টা করে এক ফোঁটা তেলও পাওয়া যায় না।

তেল কূপ খোঁড়া খুব ব্যয়সাধ্য। একটা কূপ খুঁড়তে কয়েক লক্ষ টাকা খরচ হতে পারে। এই ভাবে টাকা খরচ করে যদি গোটা দশেক কূপ খুঁড়তে হয় আর এক ফোঁটা তেলও যদি না পাওয়া যায় তা'হলে উৎসাহ অনেকটা কমে যাবার কথা। সেই জন্য বিশেষ সাবধনতার সঙ্গে অনেক পরীক্ষা করে, অনেক হিসেব নিকেশ করে তবে আজকাল তেল-কূপ খুঁড়বার কাজে হাত দেওয়া হয়। তবু মাঝে মাঝে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা খরচ হয়ে যায় এবং খরচাটা লোকসানের খাতায় লিখে রাখতে হয়। এই লোকসান থেকে অভিজ্ঞতা বাড়ে, জ্ঞান সঞ্চয় হয়।

অনেক সময় তেলের সন্ধান পাওয়া যায় গভীর জঙ্গলে, মরুভূমির তলায়, সমুদ্রের কিনারে অথবা এই রকম কোন দুর্গম স্থানে। কিন্তু মানুষের কাছে দুর্গম স্থান বলে কিছু নেই। সুতরাং এই সব দুর্গম স্থানকে সুগম করে তুলবার চেষ্টা করতে হয় এবং তার উপায়ও উদ্ভাবিত হয়েছে। জঙ্গল কেটে রাস্তা তৈরী করা হ'ল, রেলের লাইন পাতা হল, নতুন শহরের পত্তন হল, কারখানা গড়া হ'ল এবং পানীয় জল এবং বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থাও করা হল। যারা সেখানে গিয়ে কাজ করবে তেল-কূপ খুঁড়বে, তেলকে বিশ্লেষণ করবে, দেশ বিদেশে চালান দেবে তাদের জন্যই এই সব প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা। এ সব আগে করতে হয়েছে এবং পরে তেল-কূপ খুঁড়ে তেল তোলা হয়েছে। এ থেকে পরিস্কার বোঝা যায় যে তেলের সঙ্গে আমাদের বর্তমান সভ্যতার

একটা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে।

তেল প্রকৃতির দান। বিজ্ঞান তাকে কার্যকরী করে তুলেছে। তেলের প্রয়োজনে আমাদের শহরের সভ্যতা বন-জঙ্গল মরুভূমি পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছে। এক কথায় বলা যেতে পারে বিজ্ঞান ও সভ্যতা এমন ভাবে জড়িয়ে পড়েছে যে বিজ্ঞানকে বাদ দিলে আমাদের জীবন একেবারে অর্থহীন হয়ে পড়বে। তেল সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে এই সত্যটাই যেন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

তেল বর্তমান সভ্যতার অগ্রদূত। তেলকে বাদ দিলে বর্তমান সভ্যতা অচল হয়ে যাবে। সভ্য জগতে আমাদেরও একটা স্থান আছে। তাই সকলের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমাদেরও এগিয়ে যেতে হবে। এগিয়ে যেতে হবে বলেই তেলের প্রয়োজন। আরো তেল চাই। আমাদের যা আছে তা যথেষ্ট নয়। তাই তেলের জন্য ব্যাপক অনুসন্ধান ভারতের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত চলেছে।

তেলের সন্ধান পাওয়া গেলে এবং তেল-কূপ খুঁড়বার সমস্ত রকম সাজ সরঞ্জামের ব্যবস্থা হয়ে যাবার পর তেল-কূপ খোড়ার কাজে হাত দেওয়া হয়। এই কাজটা হল ইঞ্জিনীয়ারিং কৌশল। বিজ্ঞানের দুটো দিক আছে। একটা হল থিওরীর দিক, হিসেবের দিক, আর একটা হল

সেই হিসেব মত কাজ করবার দিক। এই কাজ করবার দিকটাই হল ইঞ্জিনীয়ারিং কৌশল।

যেখানে তেলের জন্য কূপ-খঁুড়তে হবে সেখানে সর্বপ্রথম বেশ একটা বড় রকমের মঞ্চ বা প্ল্যাটফরম তৈরি করা হয়। এই প্ল্যাটফরম বেশ মজবুত হওয়া দরকার। এরি ওপর বেশ উঁচু একটা টাওয়ার খাড়া করা হয়। টাওয়ার হল খুব উঁচু একটা স্তম্ভ বা মিনার। এটা ইস্পাত দিয়ে খুব মজবুত করে তৈরি করা হয়। টাওয়ারের ভেতরটা ফাঁপা থাকে এবং বাইরের দিকটায়ও শুধু ফ্রেম বা কাঠামোটা দেখা যায়। এই টাওয়ারটি চল্লিশ পঞ্চাশ মিটার পর্যন্ত উঁচু হয়ে থাকে (হাত দিয়ে মাপলে প্রায় একশো হাত উঁচু হবে)। এই জিনিসটাকেই বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় ডেরিক। (কলকাতায় যারা থাকো, তোমরা খিদির পুরে জাহাজ দেখতে গেলে অনেক ডেরিক দেখতে পাবে, তবে সেগুলো অনেক ছোট)। ডেরিকের ভেতর অনেক পুলী বা বা ঘূর্ণি চাকা বসানো থাকে এই সব ঘূর্ণিচাকার সাহায্যে মোটা মোটা তারের দড়ি ওঠানামা করে। ভারী ভারী মাল তুলবার জন্য বা নামাবার জন্য এই সবের প্রয়োজন হয়। এই ঘূর্ণি চাকা এবং তারের দড়ির সাহায্যে একটা চৌকো ফাঁপা নল আস্তে আস্তে প্ল্যাটফরমের ঠিক মধ্যিখানে বসানো হয়। এই চৌকো ফাঁপা নলটির বৈজ্ঞানিক নাম হল কেলী। প্ল্যাটফরমের মধ্যিখানেও একটা চৌকো গর্ত করা হয় যার ভেতর দিয়ে এই কেলী যেতে পারে। এই চৌকো গর্তটা এমনভাবে তৈরী যে তাকে ইচ্ছামত ঘোরানো যায়। চৌকো গর্তটা ঘুরবে কিন্তু মেজে বা প্ল্যাটফরম ঘুরবে না। ব্যাপার খানা ভাল করে বুঝতে হলে একটা গ্রামোফোনের সঙ্গে খানিকটা তুলনা করা যেতে পারে।

গ্রামোফোনে দম দিলেই তার চাকাটা ঘূরতে থাকে কিন্তু গ্রামোফোনটা ঘোরে না। এখন এই চাকাটার মাঝখানে যদি একটা চৌকো গর্ত করা যায় তাহলে চাকাটার সঙ্গে সেই গর্তটাও ঘূরবে। প্ল্যাটফরমের ওপর চৌকো গর্তটাও ঠিক ওই ধরনের, গর্তটার চারদিকে একটা চাকা থাকে। অর্থাৎ প্রথমে একটা চাকা তৈরি করা হয় যা প্ল্যাটফরমের ওপর ঘূরতে পারবে এবং সেই চাকাটার মধ্যিখানে একটা চৌকো গর্ত করা হয়। এই চাকাটাকে বলা হয় টার্ন টেবিল। এই টেবিলটাকে ঘোরাবার জন্য বেশ একটা শক্তিশালী ইঞ্জিনের দরকার হয়। ইঞ্জিনের সাহায্যে প্ল্যাটফরমের ওপর বসানো টার্ন টেবিল অর্থাৎ চাকাটাকে ঘোরানো হয়, আর চাকাটা ঘূরতে থাকলে তার মধ্যিখানে বসানো চৌকো গর্তটাও ঘূরতে থাকে। এই গর্তের ভেতর বসানো থাকে চৌকো ফাঁপা নলটা, অর্থাৎ কেলী, সুতরাং কেলীও ঘুরতে থাকে। (এইভাবে যাতে ঘুরতে পারে সেই জন্য কেলী এবং গর্তটাকে চৌকো করা হয়েছে, কারণ এগুনোকে যদি গোল করা হত তাহলে গর্তটা ঘুরতো কিন্তু কেলী হয়ত ঘুরতো না)। এই কেলীর নীচের দিকে মাটি, পাথর প্রভৃতি কাটবার জন্য একটা যন্ত্র স্ক্রু দিয়ে আটকানো হয়। এই যন্ত্রটির বৈজ্ঞানিক নাম হল 'বিট'। বিট কথাটা ইংরাজী বাইট থেকে এসেছে। বাইট মানে কামড়ানো।

এই বিট যন্ত্রটা অনেকটা আমাদের মুখের চোয়ালের মত। খুব মজবুত ইস্পাতের দাঁত এতে সারি সারি সাজানো থাকে। এই দাঁত দিয়ে মাটি পাথর কেটে কেটে মাটির তলায় যাবার রাস্তা করে নেওয়া হয় এই যন্ত্রটির সাহায্যে। এই জন্যই বোধ এই যন্ত্রটির নাম বিট দেওয়া হয়েছে।
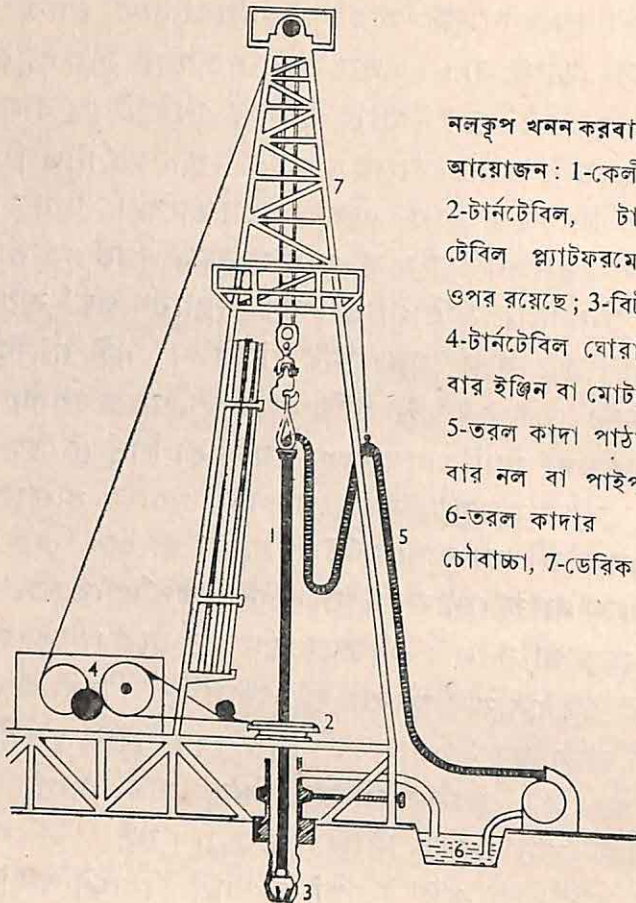
নলকূপ খনন করবার আয়োজন : 1-কেলী, 2-টার্নটেবিল, টার্ন টেবিল প্ল্যাটফরমের ওপর রয়েছে ; 3-বিট, 4-টার্নটেবিল ঘোরা-বার ইঞ্জিন বা মোটর 5-তরল কাদা পাঠা-বার নল বা পাইপ, 6-তরল কাদার চৌবাচ্চা, 7-ডেরিক ।

প্রথম প্রথম কেলীর তলায় বিট লাগিয়ে টার্ন টেবিলের চৌকো গর্তটায় বসানো হয়। তারপরে টার্ন টেবিলটাকে আস্তে আস্তে ঘোরানো হয়। তার ফলে কেলীও ঘুরতে থাকে এবং আস্তে আস্তে মাটি কেটে কেটে মাটির ভেতর ঢুকে যেতে থাকে। কেলী যখন বেশ খানিকটা মাটির ভেতর ঢুকে যায় তখন ঘোরানো বন্ধ করে পুলী ও লোহার দড়ির সাহায্যে কেলীকে

উঠিয়ে নেয়া হয়। কেলী থেকে বিটও খুলে নেয়া হয়। পরে কেলীকে আবার চৌকো গর্তটায় বসিয়ে দেওয়া হয়।

এরপরে একটা গোল ফাঁপা নলের তলায় বিট লাগানো হয়। এই নলটি কেলীর চাইতে সরু তাই কেলীর ভেতরে অনায়াসে ঢুকে যেতে পারে। এইবার তেল-কূপ খোঁড়ার আসল কাজ সুরু হবে।

এখন তা হলে টার্নটেবিলের চৌকো গর্তের ভেতর রয়েছে কেলী, কেলীর ভেতর রয়েছে গোল ফাঁপা নল এবং এই ফাঁপা নলের তলায় আটকানো রয়েছে বিট। এখন টার্নটেবিলটা ঘোরালে এরা সবাই ঘুরতে থাকবে। সুতরাং বিট তার ধারালো দাঁত দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে মাটি কেটে কেটে ভেতরে ঢুকবে, অর্থাৎ মাটির তলায় যেতে থাকবে। এরই আর এক নাম হল ড্রিল করা বা কুয়ো খোঁড়া। গোল ফাঁপা নলকে বলা হয় ড্রিল ষ্ট্রিং। এই ড্রিল ষ্ট্রিং সাধারণত তিরিশ ফিটের মত লম্বা হয়। সুতরাং তিরিশ ফিট মাটি খোঁড়া হলেই আর একটি ড্রিল ষ্ট্রিং বা ফাঁপা নল যোগ করে দিতে হয়। এমনি করে একটার পর একটা ফাঁপা নল যোগ করে যেতে হয়।

বিটের দাঁতগুলো বেশ মজবুত ও ধারালো। তা হলেও মাটি ও পাথর কাটতে কাটতে এই দাঁতগুলো ভোঁতা হয়ে যেতে পারে, ভেঙ্গেও যেতে পারে। নরম মাটিতে একটা বিটই চার পাঁচশো ফিট পর্যন্ত মাটি কেটে কেটে যেতে পারে। কিন্তু শক্ত পাথরের স্তরে আঘাত লাগলেই কয়েক ফিট যেতে না যেতেই বিটের দাঁত ভাঙতে থাকে। সুতরাং মাঝে মাঝে বিট বদলে দিতে হয়। অর্থাৎ পুরানো ভাঙা বিটটা খুলে নিয়ে সেই জায়গায় একটা নতুন বিট লাগিয়ে দিতে হয়। তার মানে সবশুদ্ধ আবার টেনে

তুলতে হয়। শুধু টেনে তুললেই হবে না, গোল ফাঁপা নলগুলিকে আবার আলাদা আলাদা করে খুলতে হবে এবং সকলের নীচে যে নলটা আছে সেইটে থেকে পুরানো ভাঙ্গা বিটটাকে খুলে নতুন বিট লাগাতে হয়। লাগাবার সময় নলগুলিকে তিরিশ ফিট করে লাগানো হয়েছিল কিন্তু খুলবার সময় নব্বই ফিট করে খোলা যেতে পারে। অর্থাৎ তিনটে নল এক সঙ্গে খোলা যেতে পারে। তবু কাজটা বেশ হাঙ্গামার। মনে কর এক হাজার ফিট ড্রিল করা হয়েছে, আরো হয়ত কয়েক হাজার ফিট ড্রিল করতে হবে। এখন যদি ঘণ্টায় ঘণ্টায় বিট বদল করতে হয় তা হলে কিরকম হাঙ্গামা হবে একবার ভেবে দেখ দেখি। শক্ত পাথরের পাল্লায় পড়লে এরকম হাঙ্গামা করতেই হবে। ঘণ্টায় ঘণ্টায় বিট বদলাতে হলে একদিনে পাঁচ সাত ফিটের বেশী খোঁড়া যায় না। আসলে একটা বিট শক্ত পাথর পাঁচ সাত ফিটের বেশী কাটতে পারে না। এই জন্যই একটা তেলকূপ খুঁড়তে মাসের পর মাস কেন বছরও লেগে যেতে পারে।

বিট দিয়ে মাটি পাথর ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কাটা হয়। এই জন্য ঘর্ষণ জনিত বেশ একটা তাপের সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ বিট গরম হয়ে ওঠে। আমরা কাজ করতে করতে যখন গলদঘর্ম হয়ে উঠি তখন আর কাজ করতে পারি না, একটু বিশ্রামের প্রয়োজন হয়। বিট তার কাজ করতে করতে গরম হয়ে উঠলে সেও আর কাজ করতে পারে না। সেই জন্য বিট যাতে সব সময় বেশ ঠাণ্ডা থাকতে পারে তার জন্য একটা ব্যবস্থা করা হয়। বিটকে ঠাণ্ডা রাখবার জন্য একরকম তরল কাদা ফাঁপা নলের ভেতর দিয়ে ঠেলে পাঠানো হয়। ঠেলে পাঠাবার জন্য পাম্পের ব্যবস্থাও করা থাকে। এই কাদা বিটকে ঠাণ্ডা রাখে এবং বিটের দাঁতের ফাঁক

দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে নলের পাশ দিয়ে আবার উপরে উঠে আসে। তার মানে নলের ভেতর দিয়ে কাদা ভেতরে যাচ্ছে এবং নলের বাইরে দিয়ে সেই কাদা আবার ওপরে চলে আসছে। শুধু তাই নয়। সেই কাদার সঙ্গে মিশে বিট যে সব মাটি পাথর কেটেছে সেই সবও চলে আসে। তার ফলে যে গর্ত বা কূপটি খোঁড়া হচ্ছে তা বেশ পরিস্কার হয়ে যায় এবং কি রকম মাটি পাথরের স্তরের ভেতর দিয়ে এই তেল কূপটি খোঁড়া হচ্ছে তা ওপর থেকেই টের পাওয়া যায়।

প্রথম প্রথম কাদার সঙ্গে বেরিয়ে আসে মাটি, বালি, চুনাপাথর প্রভৃতি। কূপটি যতই গভীর হতে শুরু করে ততই রকমারি পাথরের টুকরো আসতে সুরু করে। এই সময় তেল বিশেষজ্ঞরা বিশেষ সাবধান হন এবং পাথরের টুকরোগুলো ভাল ভাবে পরীক্ষা করে দেখতে থাকেন। এই সব পাথরের টুকরো-গুলোর ভেতর তেলের একটু আভাষ পেলেই বিশেষজ্ঞরা আরো সাবধান হন কারণ তেল-বাহী পাথরের স্তরে আঘাত করলেই মাটির ভেতরের গ্যাস ও জলের চাপে হুহু করে তেল বেরিয়ে আসতে থাকবে এবং সেটা সামলানো বেশ মুস্কিল হবে। তারপর কোন রকমে একটু আগুন একবার লাগলেই হল, একেবারে লঙ্কাকাণ্ড হয়ে যাবে। অনেক তেলকূপ নাকি এইভাবে নষ্ট হয়ে গেছে।

মাটির তলায় অনেক জল অনেক জায়গায় আটকে আছে। এই জল বেরিয়ে আসতে পারছে না। তেলও সাধারণত এই রকম জায়গায় এসে জমা হয়। তবে তেল জলের চাইতেও হাল্কা, তাই তেল জলের ওপরে থাকে। কিছু তেল আবার গ্যাস হয়ে যায়। গ্যাস তেলের চাইতেও হাল্কা। তাই গ্যাস তেলের ওপরে
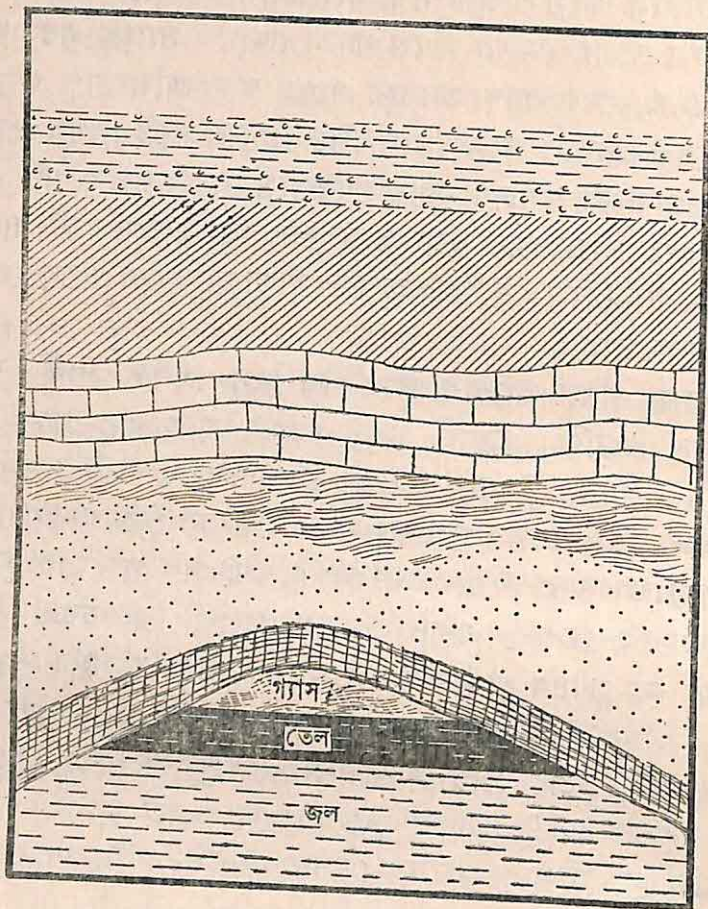
মাটির তলায় তেলের অবস্থান

থাকে। তাহলে বোঝা যাচ্ছে ওপর থেকে গ্যাস এবং নীচের দিক থেকে জল তেলকে চেপে ধরে রেখেছে। তাই একটু ফাঁক পেলেই তেল হুহু করে বেরিয়ে আসবার চেষ্টা করবে। তেল বিজ্ঞানীরা এসব তথ্য বেশ ভাল করে জানেন, তাই আগে থেকেই সাবধান হয়ে থাকেন।

সে যাই হোক, তেল কূপ খুঁড়তে খুঁড়তে এমন একটা সময় আসে যখন বিশেষজ্ঞদের বিশেষ সাবধান হতে হয়। এই রকম সময়ে তাঁরা ওই ফাঁপা নলের মধ্যেদিয়ে বিশেষ এক ধরনের ভারী কাদা ঠেলে পাঠিয়ে দেন। এই কাদার কাজ হল যদি তেল বেরিয়ে আসবার চেষ্টা করে তাহলে তাকে চাপা দিয়ে আটকে রাখবে। তাছাড়া এই সময় কেলীর ওপর নানা রকম কল-কব্জা পাইপ বসানো হতে থাকে। জলের কল যেমন খুললেই জল বের
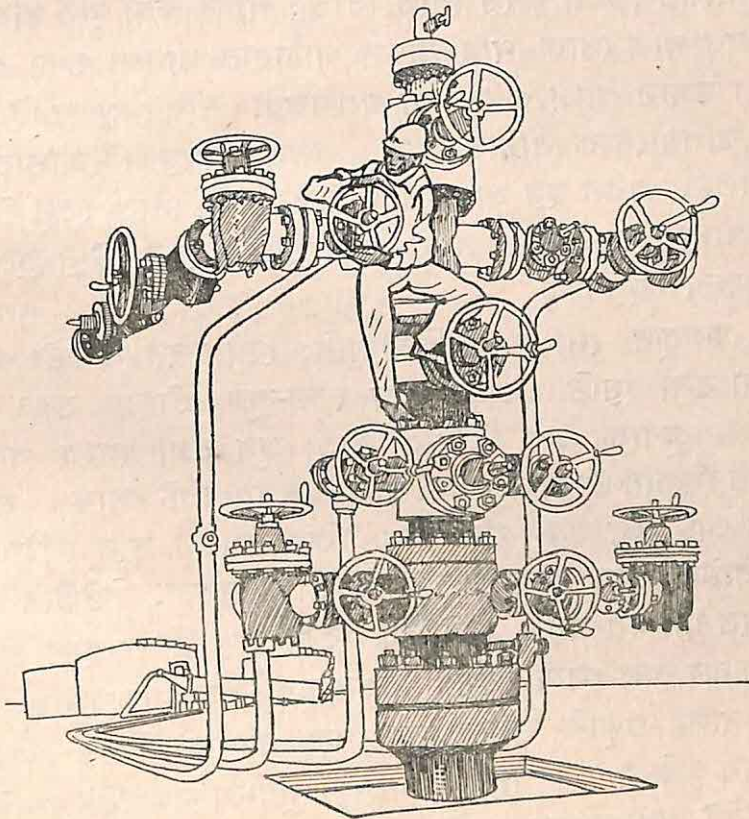
তেলের আভাষ পাওয়া গেলেই কেলীর ওপর নানা রকম কল-কব্জা বসানো হতে থাকে।

তেলের শোধনাগার
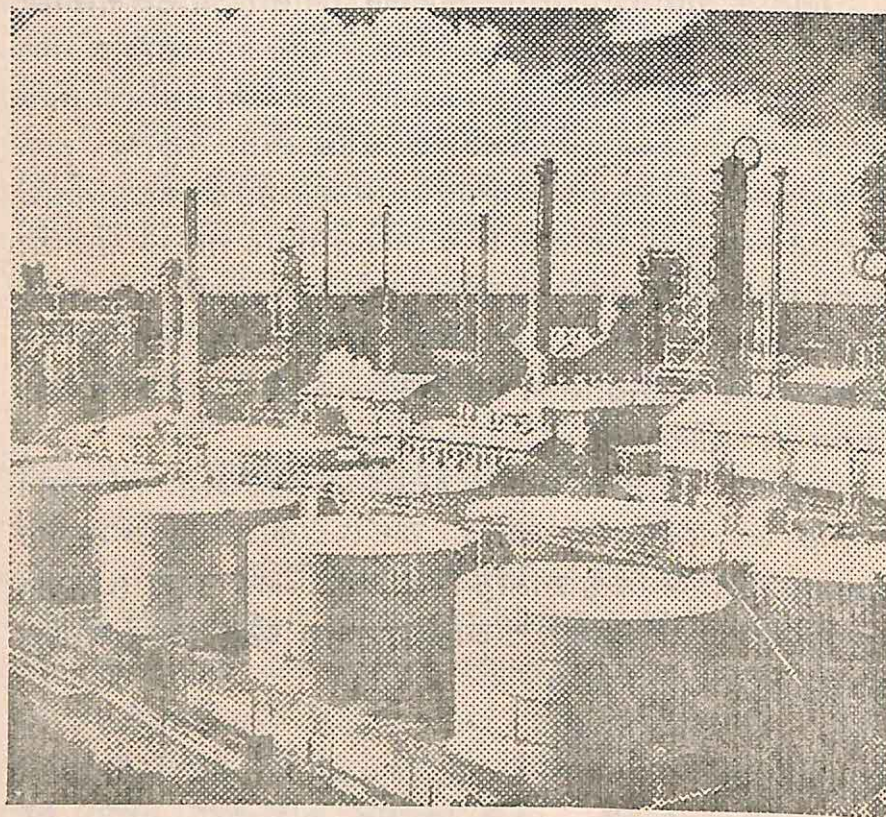
তেলের খনি থেকে আমরা যে তেল পাই তাকে বলা হয় ক্রুড অয়েল বা অশোধিত তেল। বিজ্ঞানের ভাষায় একেই বলা হয় পেট্রোলিয়াম। মাটি খুঁড়ে তুলতে হয় বলে একে খনিজ তেলও বলা চলে।

ক্রুড অয়েল বা পেট্রোলিয়াম দেখতে অনেকটা আলকাতরার মত। এই অশোধিত তেলকে শোধন করা হলে আমরা পাই চার রকমের তেল।

এক রকম হল বেশ ভারী তেল। এই তেল দিয়ে কল-কব্জা, যন্ত্রপাতি মস্থণ এবং চালু রাখা হয়। এক কথায় একে কলে দেবার তেল বলা যেতে পারে।

আর এক রকমের তেল হল ডিজেল তেল। এই তেল দিয়ে ভারী ভারী লরী চালানো হয়। কলের লাঙ্গল, জলের পাম্প রেলগাড়ী প্রভৃতিও এই তেল দিয়ে চালানো হয়ে থাকে।

তারপর হল কেরোসিন। এ তেল আমাদের খুবই পরিচিত। আলো ও স্টোভের জন্য এ তেলের প্রয়োজন আমাদের রোজই হয়। তা ছাড়াও কেরোসিন তেলের আরো অনেক রকম ব্যবহার আছে। তারপরেই আসে পেট্রল। মোটর গাড়ী হাওয়াই জাহাজ প্রভৃতি চালাতে পেট্রল প্রয়োজন।

ক্রুড অয়েল বা অশোধিত তেলকে শোধিত করে এইসব তেল পাওয়া যায়। তেল শোধন করবার জন্য শোধনাগারের প্রয়োজন। শোধনাগার হল বিরাট এক কারখানা।

যেখানে তেল শোধন করা হয় সেটা খুব উঁচু ধরনের একটা টাওয়ার বা মিনারের মত উঁচু স্তম্ভ। অনেকটা পাঁচ-ছ তলা বাড়ীর মত। এর নীচের তলায় পেট্রোলিয়াম বা অশোধিত তেল রাখা হয়। তারপর প্রত্যেক তলায় একটি করে খোপ আছে।

অশোধিত তেলকে গরম করলে তা আস্তে আস্তে গ্যাস হয়ে যায়। গ্যাস হলেই তা উপরের দিকে উঠতে থাকে। এই গ্যাসের ভেতর চার রকম তেলের গ্যাসই মিশে আছে।

প্রথম তলায় উঠতে উঠতেই কিছু গ্যাস একটু ঠাণ্ডা হয়ে যায় এবং সবচেয়ে ভারী তেলের গ্যাস এইখানের খোপে আটকা পড়ে যায়। এইখানেই এই গ্যাস ঘন হয়ে আবার তেলে রূপান্তরিত হয়। এইটেই হল কলে দেবার ভারী তেল বা লুব্রিকেটিং অয়েল। পরে অবশ্য এই তেলকে আরো শোধন ও পরিমার্জন করা হয়।

এই ভাবে দোতলার খোপে ডিজেল তেল জমা হয়, তিন তলার খোপে কেরোসিন তেল, এবং চার তলার খোপে পেট্রল জমা হয়। আরো ওপরে কিছু গ্যাস, গ্যাস হিসেবে থেকে যায়। এর পরেও শোধনাগারে আরো অনেক রাসায়নিক কাজ করতে হয়।

নীচের তলায় যে অশোধিত তেল ছিল তার সবটুকু কিন্তু গ্যাস হয়ে যায় না। কিছু অবশিষ্ট থাকে। সেই সব অবশিষ্ট থেকেও নানারকম প্রয়োজনীয় জিনিস পাওয়া যায়। তাদের ভেতর একটার নাম হল প্যারাফিন। প্যারাফিন দেখতে অনেকটা মোমের মত। এই দিয়ে মোমবাতিও তৈরি করা যায়। তাই প্যারাফিনের আর একটা নাম হল খনিজ মোম।

অশোধিত তেলের অবশিষ্ট অংশ থেকে বিটুমেন, অ্যাসফাল্ট, পীচ এবং আরো অনেক রকম রাসায়নিক পদার্থ, অনেক রকম ডাক্তারী ওষুধ, এবং আরো অনেক কিছু পাওয়া যায়। সে সব নিয়ে আলোচনা করতে গেলে আরো কয়েকখানা বই লেখা দরকার।

তেল শোধনাগার সাধারণত তেল-কূপের কাছাকাছিই তৈরী করা হয়। তবে জায়গাটা এমন হওয়া দরকার যেখানে সহজেই যাতায়াত করতে পারা যায়। কারণ এই শোধনাগারে রোজ হাজার হাজার পিপে অশোধিত তেল আসবে এবং রোজ এখান

থেকে হাজার হাজার পিপে শোধিত তেল বিভিন্ন জায়গায় পাঠাতে হবে। এই পরিবহণের কাজটাও বেশ হাঙ্গামার। যে দেশ যত উন্নত সেই দেশে এই পরিবহণ সমস্যাও তত বেশী।

বড় বড় শিল্পে-উন্নত দেশে পরিবহণের কাজটা বেশীর ভাগ হয়ে থাকে পাইপ লাইনের সাহায্যে। পাইপ লাইনকে বলা যায় নলপথ। মাটির তলা দিয়ে মোটা মোটা নল বসানো হয়। এই নল এক শহর থেকে আর এক শহরে, এক অঞ্চল থেকে আর এক অঞ্চলে চলে গেছে। এই নলের ভেতর দিয়ে অশোধিত তেল শোধনাগারে আসে আর শোধনাগার থেকে শোধিত তেল শহরে শহরে চলে যায়। আমেরিকায় মাটির তলায় এত নলপথ আছে যে একজন বিজ্ঞানী হিসেব করে বলেছিলেন যে যদি মাটির তলা থেকে সমস্ত নল তুলে এনে পরপর জোড়া লাগানো যায় তা হলে তা এত লম্বা হবে যে আমাদের পৃথিবী থেকে তা চাঁদে গিয়ে ঠেকবে। পৃথিবী থেকে চাঁদ প্রায় আড়াই লক্ষ মাইল দূরে।

আমাদের দেশে তেল-কূপ খুব বেশী নেই, তবে কয়েকটি বেশ বড় শোধনাগার আছে। তার কারণ তেলের প্রয়োজন মেটাবার জন্য অনেক তেল আমরা অন্যান্য দেশ থেকে আমদানী করি। এই তেল অশোধিত তেল, তাই শোধনাগারের প্রয়োজন।

সমুদ্রগামী জাহাজে করে বিদেশ থেকে তেল আসে। তেল বহনকারী জাহাজ আবার একটু অন্য ধরনের। আমাদের বড় বড় শোধনাগারগুলি তাই সমুদ্র বন্দরের কাছাকাছি স্থাপিত হয়েছে। বম্বে, কোচিন, বিশাখাপত্তম প্রভৃতি জায়গায় তাই বড় বড় শোধনাগার আছে। আসামের ডিগবয় অঞ্চলে তেলের খনি আছে। এই তেল শোধনের জন্য গৌহাটির কাছে একটি বড় শোধনাগার আছে। আর একটি শোধনাগার আছে বিহারের
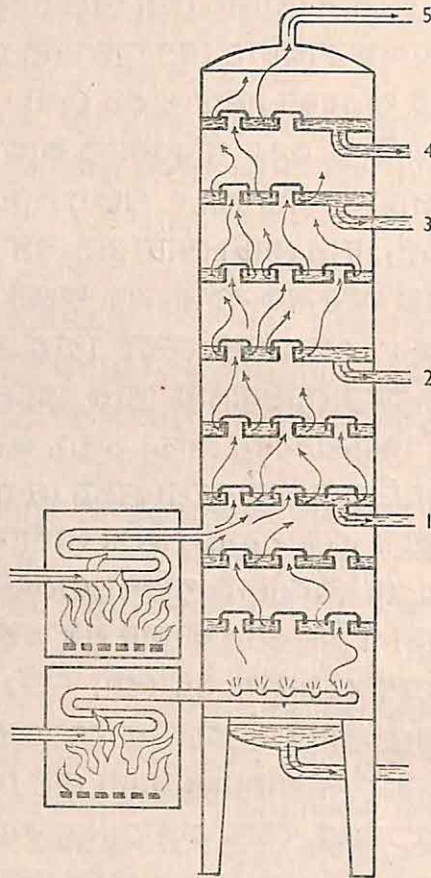
তেল শোধন স্তম্ভ বা টাওয়ার ঃ
1. ভারী তেলের খোপ ; 2. ডিজেল তেল ; 3. কেরোসিন ; 4. পেট্রল ; 5. গ্যাস। তলায় প্যারাফিন এবং সবচেয়ে নীচে অন্যান্য জিনিস জমা হয়।

বারুণী নামক স্থানে। ডিগবয় থেকে যাতে সহজেই তেল এই সব শোধনাগারে যেতে পারে তার জন্য পাইপ লাইনও বসানো

হয়েছে। সুতরাং শিল্পে উন্নত দেশগুলি থেকে আমরা খুব বেশী পিছিয়ে নেই।

সম্প্রতি কলকাতার কাছে হলদিয়াতে একটি মস্ত বড় শোধনাগার স্থাপিত হয়েছে। এই শোধনাগার থেকে পাইপ লাইন বম্বে পর্যন্ত বসানো হয়েছে। এটা যে কত বড় ইঞ্জিনীয়ারিং বাহাদুরি তা ভাবতেও বেশ অবাক লাগে। বারশো মাইলেরও বেশী হবে, বসাতে কয়েক বছর লেগে গেছে, হাজার হাজার লোক কাজ করছে। হলদিয়া সমুদ্রেরও কাছে। তেলবাহী জাহাজও এখানে ভিড়তে পারবে। অনেকে মনে করেন কয়েক বছরের ভেতর হলদিয়া কলকাতার চাইতেও জমকালো শহর হয়ে যাবে।

তেল সম্পদে আমরা অনেক পিছিয়ে আছি। কিন্তু পিছিয়ে থাকাটা কোন কাজের কথা নয়। বেদের সেই অমৃত বাণী আমাদের অন্তরে আজো প্রতিধ্বনি তুলছে—চরৈবেতি—এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো। তাই আজ দিকে দিকে গ্রামে গ্রামে, বনে-জঙ্গলে, পাহাড়ে-পর্বতে, সমুদ্রের তলায় ব্যাপক ভাবে তেলের জন্য অনুসন্ধান চালানো হচ্ছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন শীগগিরই আমরা তেল সম্পদে স্বয়ং সম্পূর্ণ হব। শুধু তাই নয়, বিদেশে রপ্তানি করবার মতও প্রচুর তেল আমাদের দেশে পাওয়া যাবে। তাই আবার বলি চরৈবেতি।

পরিশিষ্ট

খনিজ তেল বা পেট্রোলিয়াম সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে কিছু ইংরাজী ও বৈজ্ঞানিক শব্দ ব্যাবহার করতে হয়েছে। তাদের ব্যাখ্যা দেওয়া হল।

অকসিজেন ঃ গ্যাস জাতীয় মৌলিক পদার্থ। পৃথিবী যে বিরানব্বইটি মৌলিক পদার্থ দিয়ে তৈরি অকসিজেন তাদের ভেতর অন্যতম। বাতাসে এখন প্রচুর অকসিজেন আছে। এক সময়ে কিন্তু ছিল না। অকসিজেন ছাড়া জীবন ধারণ করা যায় না।

অকসাইড ঃ অকসিজেন মিশে আছে এমন সব পদার্থ।

আগ্নেয় শিলা ঃ পৃথিবী এক সময় খুব গরম ছিল। তখন সব কিছু হয় তরল না হয় গ্যাস হয়ে ছিল। গরম তরল পদার্থ ঠাণ্ডা হলে জমে পাথর হয়ে যায়। এদেরই বলা হয় আগ্নেয় শিলা।

ইনকা সভ্যতা ঃ দক্ষিণ আমেরিকায় পেরু নামে এক রাজ্য ছিল (পেরু এখনও আছে) রাজার নাম ছিল ইনকা। এটা খুবই প্রাচীন রাজ্য, খুব উন্নত এবং সভ্য। রাজার নাম থেকেই ইনকা সভ্যতা বলা হয়।

এরোপ্লেন ঃ উড়ো জাহাজ, হাওয়াই জাহাজ।

কারবন ঃ একটি মৌলিক পদার্থ, বাংলায় আমরা অঙ্গার বলতে পারি।

কারবন ডাই-অকসাইড ঃ এক রকম গ্যাস, এতে কারবন এবং অকসিজেন আছে। গাছের প্রধান খাদ্য। আমরা যে নিশ্বাস ফেলি তাতে কারবন ডাই-অকসাইড আছে।

কেসিং ঃ আবরণ বা খাপ। ইস্পাতের পাত দিয়ে পেট্রল তোলার ফাঁপা নলটিকে ঘেরাও করে দেওয়া হয়। এরই নাম কেসিং। ইসপাতের পাতকে বলা হয় লাইনিং (এই অর্থ শুধু তেল-কূপের বেলায় হবে)।

ক্রুড অয়েল ঃ অপরিশোধিত তেল। খনি থেকে যে তেল পাওয়া যায়, অর্থাৎ পেট্রোলিয়াম।

টাওয়ার ঃ খুব উঁচু মিনার বা স্তম্ভ। খুব উঁচু জিনিসকেই টাওয়ার বলা হয়, অথবা টাওয়ারের সঙ্গে তুলনা করা হয়।

টার্ন টেবিল ঃ টার্ন মানে ঘোরা, আর টেবিল মানে টেবিল। অর্থাৎ যে টেবিল ঘোরানো যায়। গ্রামোফোনের গোল চাকতিটি যেটা ঘোরে তাকে টার্ন টেবিল বলা হয় সুতরাং ঐ রকম কোন জিনিস।

ড্রিল ঃ খনন করা, খোঁড়া, গর্ত করা।

ড্রিল স্ট্রিং ঃ স্ট্রিং মানে দড়ি। দড়ি দিয়ে কতখানি গর্ত হল তা মাপা যায়। তাই ফাঁপা নলটি হ'ল ড্রিল স্ট্রিং। কারণ একটি নল ঢুকে গেলে বুঝতে হবে তিরিশ ফিট গর্ত হয়েছে।

ডেরিক ঃ ভারী মাল ওপরে ওঠাবার ও নামাবার যন্ত্র বিশেষ।

নাইট্রোজেন ঃ মৌলিক গ্যাস। বাতাসের বেশীর ভাগই নাইট্রোজেন।

পাইপ লাইন ঃ পাইপ মানে নল এবং লাইন মানে রেখা বা পথ। অর্থাৎ নল বসিয়ে যে পথ করা হয়। নল-পথ। মাটির তলায় নল বসিয়ে এরকম পথ করা হয়।

পাললিক শিলা ঃ কাদা, মাটি, বালি চুন প্রভৃতি স্তরে স্তরে জমা হয়ে পরে শক্ত হয়ে যে পাথর হয় তাকে বলা হয় পাললিক শিলা। আগ্নেয় শিলায় এ রকম স্তর থাকে না।

পুলী ঃ ঘূর্ণি চাকা বা কপিকল। ভারী জিনিস তুলবার অথবা নামাবার জন্য এই কপিকলের চাকার ভেতর দিয়ে দড়ি ওঠা নামা করে।

পেট্রোলিয়াম ঃ খনিজ তেল। খনি থেকে যে তেল পাওয়া যায়, অশোধিত তেল, অনেকটা আলকাতরার মত দেখতে। পেট্রোলিয়াম ও পেট্রল কিন্তু এক জিনিস নয়।

পেট্রল ঃ শোধিত পেট্রোলিয়াম। স্বচ্ছ জলের মত তেল, অতি সহজেই আগুন ধরে।

প্ল্যাটফরম ঃ যে কোন উঁচু সুরক্ষিত স্থান যেখানে বসে বা দাঁড়িয়ে কাজ করা যায় ; মঞ্চ।

ফলট : মাটির তলায় নানারকম পাথরের স্তর আছে। মাঝে মাঝে কোন কারণে এই স্তর ভেঙ্গে যেতে পারে। ভাঙ্গা জায়গাটাকে বলা হয় ফলট ; সেই সময় ভূমিকম্পও হতে পারে।

ব্যাবিলন : প্রাচীন সভ্যতার কেন্দ্রস্থল। এইখান থেকেই আর্য সভ্যতা বিস্তার করে। একদল যায় মিশরের দিকে আর একদল যায় গ্রীসে ও রোমে এবং একদল আসে ভারতের দিকে। কয়েক হাজার বছর আগেকার কথা।

বিট : ছেদন যন্ত্র, যা দিয়ে ছ্যাঁদা করা যায়, গর্ত করা যায়। বিট অনেক রকমের আছে। খুব ধারালো ইস্পাতের দাঁত থাকে, তবে তেল-কূপ খুঁড়বার জন্য অনেক বিটে হীরকের দাঁত ও থাকে। হীরক ইস্পাতের চাইতেও শক্ত।

রিজারভয়ার : ভাণ্ডার, বড় পুকুর। অর্থাৎ বড় পুকুরের মত ভাণ্ডার।

লুব্রিকেটিং অয়েল : এক রকম ভারী তেল, যন্ত্রপাতির কল-কব্জায় দেওয়া হয়। কলে দেবার তেল। এই তেল নানারকমের হতে পারে।

শেল : মাটি কাদা যখন জমাট বেঁধে পাথর হয়ে যায় তাকে বলা হয় শেল। শেল পাললিক শিলা।

স্টিম ইঞ্জিন : বাষ্পে চালিত ইঞ্জিন।

স্টেথোস্কোপ : বুক পরীক্ষা করবার জন্য ডাক্তারী যন্ত্র।

হাইড্রোজেন : একটি মৌলিক গ্যাস। সবচেয়ে হাল্কা। জলে দুই ভাগ হাইড্রোজেন আছে।

হাইড্রোজেন অকসাইড : হাইড্রোজেনের সঙ্গে অকসিজেন যুক্ত হয়েছে। আসলে এটা হল জল। জলের রাসায়নিক নাম বলা যেতে পারে।